কিতাবুল ঈমান

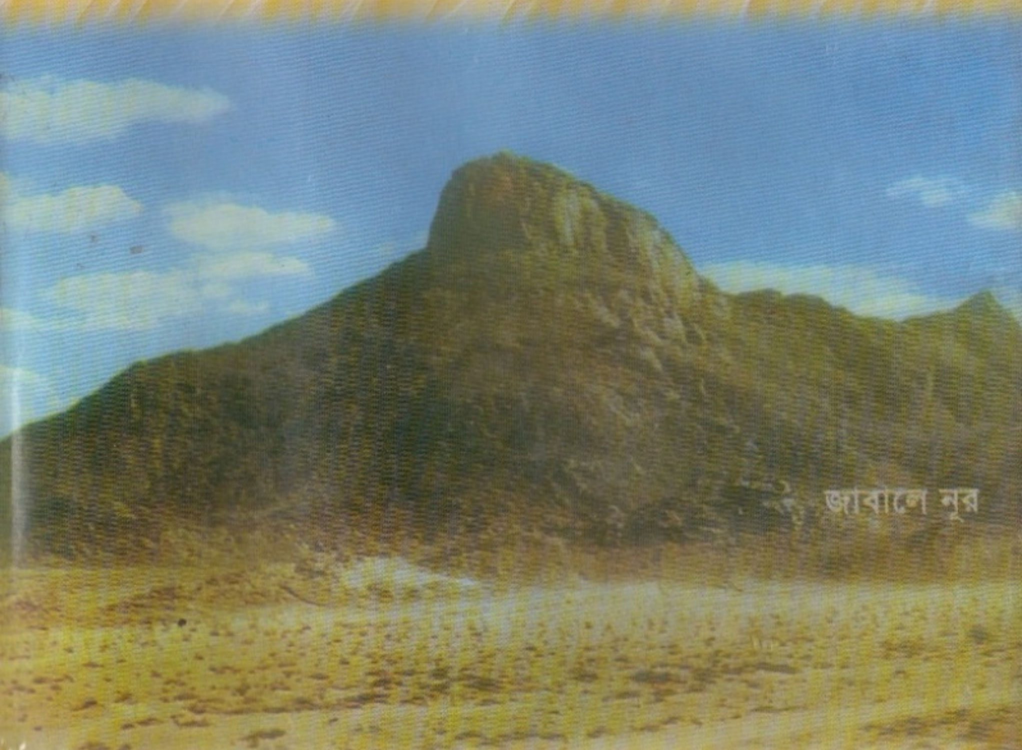

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

www.nagorikpathagar.org

কিতাবুল ঈমান

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১ ৮৮ ৭৩

প্রকাশনায় ঃ
রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স
রাহমানিয়া ভবন (২য় তলা)
সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১ ৩৬ ৯০

www.nagorikpathagar.org

কিতাবুল ঈমান

সংকলনে ঃ
মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

প্রকাশক ঃ
রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল গনী
৮৬, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।

সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় ঃ
মাসিক রাহমানী পয়গাম পরিবার

« সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত »

প্রকাশ কাল
১ম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং
২য় (সংস্করণ) ঃ আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স
রাহমানিয়া ভবন, সাতমসজিদ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
...মরীনা বিনতে মুজাহিদ

ভূমিকা

باسمه تعالى

হামদ ও সালাতের পর- আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্ব ক তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে-আল্লাহর ইবাদত করা। এই ইবাদত হীহ ঈমান ও নেক আমলের মধ্যেই মানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। আর এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতিতে তি, ধ্বংস ও জাহান্নাম অনিবার্য। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় ও কুদরতের বর্ণনা দিয়ে থেকে নিজের প্রভুত্বের স্বীকারোক্তিমূলক অঙ্গীকার নেয়ার পর দুনিয়াতে তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে প্ররণ করেছেন অসংখ্য নবী, রাসূল ও পয়গাম্বর (আঃ)। সকল পয়গাম্বরের মৌলিক শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা ই এক আল্লাহর প্রতি ও হাশর-নাশরের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল ইত্যাদি বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন।

ঈমান ও আমল উভয়টা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়। সুতরাং মেহনত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে উক্ত ম্যবান দু'টি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা এবং তা খুব মজবুত ও দৃঢ় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেকগুণ বেশী। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হবে (যদিও থম অবস্থায় না হোক), কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। যথার্থ ঈমান ব্যতীত শুধু দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন সুরত নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে চরম ফিতনার যুগে অনেক মানুষ সকালে মুমিন থাকলেও বিকালে ঈমানহারা আবার কেউ বিকালে মুমিন থাকলেও সকালে ঈমান নষ্ট করে ফেলছে। কিন্তু মানুষের ঈমান আকীদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। অথচ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দরুণ এতদসম্পর্কিত অধিক সংখ্যক বপত্র রচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকা ছিল একান্ত জরুরী।

এতদুদ্দেশ্যে আমি নালায়েক 'আকীদাতুত ত্বাহাবী, শরহে আক্বায়িদ, তা'লীমুদ্দীন, ফুরুউল ঈমান সহ বিভিন্ন কিতাব সহীহ আকীদা সমূহ পেশ করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। যাতে করে সাধারণ মানুষের বুনিয়াদী ঈমান-আকীদা হয়ে যায়। পাশাপাশি তা পরিপূর্ণ ও মজবুত করার জন্য ঈমানের শাখাগুলোর বিবরণ পেশ করেছি। আর ঈমানকে হতের জন্য ভ্রান্ত আকীদা, কুফরী ও শিরকী কথা এবং কতিপয় ভুল রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা দিয়েছি। যেন কেউ । আকীদা পোষণ করে নিজের ঈমান ধ্বংস করে না ফেলে। আর ৪র্থ অধ্যায়ের শেষাংশে গুনাহে কবীরার বিবরণ । পেশ করা হয়েছে, যাতে করে এগুলোকে মানুষ গুনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানী বলে বিশ্বাস করে নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখে। গুনাহ কবীরাকে হালাল বা জায়িয মনে করলে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে। এজন্য গুনাহের থাকা ঈমানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ বিষয়াদি মিলে বইটি রুগ্ন মুসলিম জাতির রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষ র হবে বলে আল্লাহর দরবারে আশা করি। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন এ কিতাবটি কবুল । এবং এটাকে মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াতের জারি'আ করেন। (আমীন)

বিনীত

মনসূরুল হক

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ সহীহ্ ঈমানের কষ্টিপাথর ....৫ – ১৭

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান ৬

ফেরেশ্তাগণের উপর ঈমান ৯

আল্লাহর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর ঈমান ৯

নবী-রাসূল (আঃ)-গণের উপর ঈমান ১০

কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান ১৩

তাকদীরের উপর ঈমান ১৪

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান....................................১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঈমানের সাতাত্তর শাখা ১৮-৩৪

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০টি কাজ–যা দিলের দ্বারা সমাধা হয় ১৯

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৭টি কাজ–যা জবানের দ্বারা সমাধা হয় ২৪

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬টি কাজ–যা নিজে নিজেই করতে হয় ২৬

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ–যা নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয় ২৯

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ–যা অন্যান্য জনসাধারণের সঙ্গে করতে হয় ৩০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা ৩৫-৮১

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৩৭

ফেরেশ্তাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৩৯

আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৪০

নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৪৭

কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৬৪

তাকদীরের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা ৬৬

ভ্রান্তি নিরসন ঃ –১, –২, –৩ ....৭০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কুফর, শিরক ও গুনাহে কবীরা ৮২-১১২

শিরক ও বিদ'আতের বর্ণনা ৮২

জাহিলিয়াতের রসমের বর্ণনা ৮৫

কবীরা গুনাহের বর্ণনা ৮৮

কতিপয় কবীরা গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ ৯০

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ১১৩-১২৮

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ ১১৩

সমাজতন্ত্রের কুফরী দিক সমূহ ১১৫

কুরআনের আলোকে গণতন্ত্রের অসারতা ১১৮

গণতন্ত্রের কুফরী দিক সমূহ ১১৯

প্রচলিত জাতীয়তাবাদ ইসলামবিরোধী ১২৫

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
... কিরণ মুন্সী ...

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়
সহীহ্ ঈমানের কষ্টিপাথর

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَ

তরজমা ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণের উপর, তাঁর কিতাব ...র উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে ...ন পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ১৩৬)

...দীসে জিবরাঈল (আঃ)-এ উল্লেখ আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ ...লার পক্ষ থেকে ছদ্মবেশে এসে নবী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈমান ... বলে?" জওয়াবে নবী (সাঃ) বললেন, "ঈমানের হাকীকত হলো–তুমি ...প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর, তাঁর ...শ্তাগণের উপর, আসমানী কিতাব সমূহের উপর, আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলগণের (আঃ) উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ ...ছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়ার উপর।" (বুখারী ও মুসলিম)

...ল্লেখিত আয়াত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এ হাদীসটি 'ঈমানে মুফাস্সাল'-এর ভিত্তি। ...ন মুফাস্সালের মাধ্যমে এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি জানানো হয় এবং ...প্রাণে বদ্ধমূল বিশ্বাসের ঘোষণা করা হয় যে,

امَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

আমি ঈমান আনলাম বা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করলাম–(১) ...হ তা'আলাকে, (২) তাঁর ফেরেশ্তাগণকে, (৩) তাঁর প্রেরিত সকল আসমানী ...বকে, (৪) তাঁর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলকে, (৫) কিয়ামত দিবসকে অর্থাৎ

www.nagorikpathagar.org

সমস্ত বিশ্বজগত একদিন শেষ হবে, তাও বিশ্বাস করি, (৬) তাকদীরকে বিশ্বাস করি অর্থাৎ জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্ট, তাঁরই পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং (৭) মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন পুনর্বার যে জীবিত হতে হবে, তাও আমি অটলভাবে বিশ্বাস করি।"

উল্লেখিত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৭ নং বিষয় ৫ নং বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রশাখা। তবে তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে তাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ঈমানের আরকান বা মূল ভিত্তি। ঈমানের এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরী। ঈমানের এ সকল বুনিয়াদী বিষয়গুলোকে এখন ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনার অর্থ একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশীদার নেই, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পুরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

সারকথা ঃ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তিনটি বিষয় অবশ্যই মানতে হবে ঃ

(ক) তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন শরীক নেই, সৃষ্টজীবের সাথে তার কোন তুলনা হয় না।

(খ) তাঁর অনেকগুলো অনাদি-অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারিত। সেসব গুণের মধ্যে অন্য কোন শরীক নেই। যেমন, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, হায়াত-মউতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরজীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সব কিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সব কিছুর উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সব কিছুর উপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি আগুনকে পানি এবং পানিকে আগুন করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি না জানেন–এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছু দেখছেন, সবকিছু শুনছেন। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোন পীর, ওলী, পয়গাম্বর বা ফেরেশ্তা

www.nagorikpathagar.org

ছাকে রদ করতে পারে না। তিনি আদেশ ও নিষেধ জারী করেন, কথা তিনিই একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের হতে পারে না, অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী করা যায় না। তাঁর কোন র কিংবা সহকর্মী বা উযীর-নাযীর নেই, তিনি একক কর্তৃত্বের অধিকারী, সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ; সবই তাঁর বান্দাহ ও গোলাম। তিনি দর উপর বড়ই মেহেরবান। তিনি সব দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে কোন রকমের দোষ-ত্রুটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভাল ময়, কোন একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ-আপদ বং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোন প্রকার বিপদ-আপদ ক্তি দিতে পারে না।

ত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজকে নিজে বড় বলতে পারেন, তীত অন্য কারো এরকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই। তিনিই সব কিছু রেছেন, সৃষ্টি করছেন এবং সৃষ্টি করবেন। তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে র গুনাহ্ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। ভাব ও প্রভুত্ব সকলের উপর; কিন্তু তাঁর উপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে নি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের আহার ান করেন। তিনিই রুযীর মালিক। রুযী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। র রুযী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুযী কম করে দেন। যার রুযী বাড়াতে রেন, বাড়িয়ে দেন। কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করা তাঁরই হাতে। তিনি চ্ছা উচ্চ সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এসব তাঁরই া, তাঁরই ইখ্তিয়ারে। অন্য কারো এতে কোন রকম ক্ষমতা বা অধিকার তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে যার জন্য যা ভাল মনে করেন, তার জন্য বস্থা করেন। তাতে কারো কোন প্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। ায়পরায়ণ, তাঁর কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই। তিনি হিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর কত নাফরমানী করছে, পর কত রকম দোষারোপ ও প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে, তারপরও তিনি তাদের জারী রেখেছেন।

নি এমনই কদরশিনাস (গুণগ্রাহী) এবং উদার যে, তাঁর আদৌ কোন ন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ

www.nagorikpathagar.org

পালন করলে, তিনি তার বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীতরূপে পুরস্কার দান করেন। তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তাঁর নিকট দরখাস্ত করলে (অর্থাৎ দু'আ করলে) তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত, তাঁর ভাণ্ডারে কোন কিছুরই অভাব নেই। তিনি অনাদি-অনন্তকালব্যাপী সকল জীবজন্তু ও প্রাণী জগতের আহার যোগান দিয়ে আসছেন। তিনি জীবন দান করছেন, ধনরত্ন দান করছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করছেন। অধিকন্তু আখিরাতেও অসংখ্য ও অগণিত সওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন; কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার তবুও বিন্দুমাত্র কমেনি বা কমবে না। তাঁর কোন কাজই হিক্‌মত ও মঙ্গল ছাড়া নয়। কিন্তু সব বিষয় সকলের সব সময় বুঝে আসে না। তাই নির্বুদ্ধিতা বশতঃ কখনও না বুঝে দিলে দিলে বা মুখে প্রতিবাদ করে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। তিনিই সব কর্ম সমাধাকারী। বান্দাহ চেষ্টা করবে, কিন্তু কার্য সমাধার ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত।

তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবিত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তাঁর হাকীকত ও স্বরূপ এবং তিনি যে কত অসীম, তা কারো বুঝার ক্ষমতা নেই, কেবলমাত্র তাঁর সিফাত অর্থাৎ গুণাবলী ও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারাই তাঁকে আমরা চিনতে পারি।

মানুষ পাপ করে যদি খাঁটিভাবে তওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি হিদায়াত দেন। তাঁর নিদ্রা নেই, সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক।

এ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে চিনবার জন্য তাঁর কতগুলো সিফাতে-কামালিয়া অর্থাৎ মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হল। এতদ্ব্যতীত যত মহৎ গুণ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তৎসমুদয় দ্বারা বিভূষিত। ফলকথা এই যে, সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবত সে সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোন দোষ-ত্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফের কোন কোন জায়গায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শুনেন, সিংহাসনাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হন বা আল্লাহ তা'আলার হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে কখনো বিভ্রান্তিতে পড়তে বা তর্ক-বিতর্ক করতে নেই। সহজ-সরলভাবে আমাদের আকীদা ও একীন এই রাখা উচিত যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের মত তাঁর উঠা-বসা বা হাত-পা তো

www.nagorikpathagar.org

য়ই নয়, তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধান! ধান!! যেন শয়তান ধোকা দিয়ে গোলকধাঁধায় না ফেলতে পারে। একীনী াঁদা ও অটল বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের সাদৃশ্য আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।

(গ) একমাত্র তিনিই মাখলূকের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর কেউ দত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ার করা নয়; বরং অস্তিত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে উপরোক্ত তাঁর গুণবাচক গুলো স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহ্ পাকের উপর পূর্ণরূপে ঈমান আনা না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

(২) ফেরেশ্তাগণের উপর ঈমান

ফেরেশ্তাগণের উপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ্ ধরনের মাখলূককে নূরের দ্বারা তৈরী করে তাঁদেরকে আমাদের চক্ষুর রালে রেখেছেন, তাঁদেরকে ফেরেশ্তা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা কোনটিই । বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলূক। অনেক ধরনের কাজ আল্লাহ্ তা'আলা দের উপর সোপর্দ করে রেখেছেন, যেমন–নবীগণের (আঃ) নিকট ওহী আনয়ন , মেঘ পরিচালনা করা, রূহ কবজ করা, নেকী-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা র্ণ নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহ্র বিন্দুমাত্র নাফরমানী করেন না। তাঁরা আল্লাহ্র প্রিয় রমাবরদার বান্দাহ্। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশ্তা অতি প্রসিদ্ধ।

উল্লেখ্য, আরেক প্রকার জীবকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করে াদের চক্ষুর অগোচর করে রেখেছেন, তাদেরকে জ্বিন বলে। তাদের মধ্যে -মন্দ সব রকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বটে এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। দের খানা-পিনার প্রয়োজনও হয়। তাদের মধ্যে সবচে'বেশী প্রসিদ্ধ ও বড় দুষ্ট ঃ 'ইবলীস শয়তান'। হাশরের ময়দানে জ্বিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে। এ কথা রআনে কারীমে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

(৩) আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর ঈমান

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ একথা বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছোট-বড় বহু কিতাব জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে াম্বরগণের (আঃ) উপর নাযিল করেছেন, তারা সে সব কিতাবের দ্বারা নিজ উম্মতকে ধর্মের কথা শিখিয়েছেন। উক্ত কিতাব সমূহের মধ্যে চারখানা

www.nagorikpathagar.org

কিতাব বেশী প্রসিদ্ধ, যা প্রসিদ্ধ চারজন রাসূলের (আঃ) উপর নাযিল করা হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। এর শব্দ ও অর্থের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসাও সম্ভব নয়। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের হিফাজতের ওয়াদা করেছেন এবং তা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। অন্যান্য কিতাবগুলোতে বেদ্বীন লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে সেগুলোর হিফাজতের ওয়াদা করেন নি। কুরআন শরীফ ও তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় সব কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন, কোন অংশ গোপন রাখেননি। সুতরাং এখন নতুন কোন কথা জারী করা দুরস্ত নয়। দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নতুন কথাকে ইলহাদ বা বিদ'আত বলে। যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ্ ও পথভ্রষ্টতা। কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া কুফরী কাজ। কোন ফরজকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। তেমনিভাবে কোন হালালকে হারাম মনে করা বা কোন অকাট্য হারাম বা গুনাহকে হালাল হিসেবে বিশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

(৪) নবী-রাসূল (আঃ)-এর উপর ঈমান

নবী-রাসূল (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য স্বীয় বান্দাহদের মধ্য হতে বাছাই করে বহু সংখ্যক পয়গাম্বর অর্থাৎ নবী-রাসূল (আঃ) মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারে এবং পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেশ্ত হাসিল করতে পারে।

পয়গাম্বরগণ সকলেই মা'সূম বা নিষ্পাপ, তাঁরা কোন প্রকার পাপ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঠিক সংখ্যা কুরআন শরীফে বা নবী (সাঃ) হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন নি। কাজেই নিশ্চিতভাবে তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এ কথা যদিও প্রসিদ্ধ যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন, কিন্তু কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বহু সংখ্যক পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তাঁদের দ্বারা অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঐসব ঘটনাকে মু'জিযা বলে। নবীগণের মু'জিযাসমূহ বিশ্বাস করাও ঈমানের অংগ।

www.nagorikpathagar.org

য়গাম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আগমন করেছেন হযরত আদম এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত দ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা (সাঃ)। তাঁর পরে অন্য কেউ নতুনভাবে নবী বা হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন নি এবং করবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) াতের পূর্বে যদিও আগমন করবেন; কিন্তু তিনি তো পূর্বেই নবী ছিলেন। নতুন ইসেবে আগমন করবেন না। আমাদের নবীর পরে অন্য কেউ নবী হয়েছেন বা বলে বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কেউ নতুন নবী র দাবী করলে, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

নিয়াতে যত পয়গাম্বর এসেছেন, সকলেই আমাদের মাননীয় ও ভক্তির পাত্র। সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করেছেন। তাদের মধ্যে পরস্পরে কোন ধ ছিল না, সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য াতের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুম জারী করেছেন। আর এ সামান্য ন্নতাও শুধু আমলের ব্যাপারে, ঈমান-আকীদার ব্যাপারে নয়। আকীদাসমূহ হতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল এক। আকীদার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল বা ার্তন হয়নি, আর হবেও না কখনো। পয়গাম্বরগণ সকলেই কামিল ছিলেন, নাকিস বা অপূর্ণ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা ছিল বেশী, কারো মর্যাদা ছিল তুলনামূলক কম।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর মর্তবা সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই বলে াণের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বড় এবং একজনকে হেয় বা ছোট করে ানো বা বর্ণনা করা নিষেধ। আমাদের নবী খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী, তাঁর নতুনভাবে আর কোন নবী আসবেন না; বরং তাঁর আগমনের মাধ্যমে য়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত জ্বিন বা ইনসান ছিল, আছে, বা সৃষ্টি হবে, লের জন্য তিনিই নবী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই ম ও তরীকা সকলের মুক্তি ও নাজাতের জন্য অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বহাল বে। অন্য কোন ধর্ম, তরীকা বা ইজম-এর অনুসরণ কাউকে আল্লাহর দরবারে য়াব বানাতে পারবে না।

নবী (সাঃ)-এর সমস্ত কথা মেনে নেয়া জরুরী। তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস ল বা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে বা । বের করলে, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ঈমানের জন্য আমাদের নবীর স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ বিশ্বাস করাও জরুরী। যে মি'রাজ বিশ্বাস করে না, সে বেদ্বীন। তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

যেসব মুসলমান আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদেরকে 'সাহাবী' বলা হয়। সাহাবীগণের অনেক ফজীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। সমস্ত সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে মহব্বত রাখা ও তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের কাউকে মন্দ বলা আমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সাহাবীগণ যদিও মা'সূম বা নিষ্পাপ নন, কিন্তু মাগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং পরবর্তী লোকদের জন্য তাঁদের সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই। 'আকীদাতুত ত্বহাবী' কিতাবে উল্লেখ আছে, "সাহাবীগণের প্রতি মহব্বত-ভক্তি রাখা দ্বীনদারী ও ঈমানদারী এবং দ্বীন ও ঈমানের পূর্ণতা। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের বিরূপ সমালোচনা করা কুফরী, মুনাফেকী এবং শরী'আতের সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।" সমস্ত সাহাবীগণের মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন–হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), তিনিই প্রথম খলীফা বরহক এবং তিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ), তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাযিঃ)।

নবী (সাঃ)-এর বিবি ও আহ্‌ল-আওলাদগণের (রাঃ) বিশেষভাবে তা'যীম করা উম্মতের উপর ওয়াজিব।

উল্লেখ্য, ওলী-বুযুর্গদের কারামাত সত্য। কিন্তু ওলী-বুযুর্গগণ যত বড়ই হোন না কেন, তাঁরা নবী-রাসূল (আঃ) তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সাহাবীর সমতুল্যও হতে পারেন না। অবশ্য হাক্কানী পীর-মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরাম যেহেতু নবী (সাঃ)-এর ওয়ারিস এবং দ্বীনের ধারক–বাহক, সুতরাং তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা, তাদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী। দ্বীনের খাদেম হিসেবে তাঁদেরকে হেয় করা, কিংবা গালি দেয়া কুফরী কাজ। মানুষ যতই খোদার পেয়ারা হোক, হুঁশ-জ্ঞান থাকতে শরী'আতের হুকুম-আহকামের পাবন্দী অবশ্যই তাকে করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কখনো মাফ হবে না। তেমনিভাবে মদ খাওয়া, গান-বাদ্য করা, পরস্ত্রী দর্শন বা স্পর্শ করা কখনো তার জন্য জায়িয হবে না। হারাম বস্তুসমূহ সর্বদা হারামই থাকবে এবং হারাম কাজ করে বা ফরজ বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে কেউ কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

(৫) কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান

কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনার অর্থ–কুরআন ও হাদীসে কিয়ামতের যতগুলো নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ঘটবে–দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা। যেমন–বিশ্বাস করা যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে বাদশাহী করবেন। 'কানা দাজ্জাল' অনেক অনেক ফিতনা-ফাসাদ করবে, তাকে খতম করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে বধ করবেন। 'ইয়াজুজ-মাজুজ' অতি শক্তিশালী পথভ্রষ্ট এক শ্রেণীর মানুষ। তারা সমগ্র দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দিবে। অতঃপর আল্লাহ্র গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। 'দাব্বাতুল আর্য' নামে এক আশ্চর্য জানোয়ার পৃথিবীতে যাহির হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে। কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সুর্য উদিত হবে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরআন শরীফ উঠে যাবে। এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা ঘটবে। তারপরে কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত মুমিনগণ মারা যাবেন এবং সমস্ত দুনিয়া কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে। আর তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।

সারকথা, কিয়ামতের সকল নিদর্শন যখন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তাতে কতিপয় জিনিষ ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমস্ত জীবজন্তু মরে যাবে, যারা পূর্বে মারা গেছে, তাদের রূহ বেহুঁশ হয়ে যাবে। অনেক দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আল্লাহ্র নির্দেশে তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তাতে সমস্ত আলম আবার জীবিত হয়ে উঠবে এবং কিয়ামতের ময়দানে সকলে একত্রিত হবে।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। ফলে মানুষের খুব কষ্ট হবে। কষ্ট দূর করার জন্য লোকেরা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বড় বড় নবীগণের (আঃ) নিকট সুপারিশের জন্য যাবে, কিন্তু কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবেন না। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর শাফা'আতে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। মীযানের মাধ্যমে নেকী-বদীর হিসাব হবে। অনেকে বিনা হিসাবেই বেহেশতে চলে যাবে, আবার অনেককে বিনা হিসাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হিসাবের পর নেককারদের ডান হাতে এবং বদকারদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। সেদিন জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে। নেককার লোকেরা তা দ্রুত পার হয়ে যাবেন, কিন্তু বদকার লোকেরা পার হওয়ার সময় পুলসিরাতের নীচে অবস্থিত দোযখের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে যাবে। সেই কঠিন দিনে আমাদের নবী (সাঃ) উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের শরবত পান করাবেন। তা এমন তৃপ্তিকর হবে, যা পান করার পর পিপাসার নাম মাত্র থাকবে না। জাহান্নামের মাঝে ভয়ানক অগ্নিকুন্ডসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির উপকরণ মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে যত বড় পাপী হোক না কেন, স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করে নবীগণের (আঃ) কিংবা অন্যদের সুপারিশে দোযখ হতে মুক্তি লাভ করে কোন এক সময় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে বা শিরকী করেছে, তারা যদি দুনিয়াতে অনেক ভালো কাজও করে থাকে, তথাপি তারা কখনো কিছুতেই দোযখ হতে মুক্তি পাবে না। দোযখীদের কখনো মৃত্যুও আসবে না। তারা চিরকাল শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন আশা-আকাংক্ষা পূর্ণ হবে না।

দোযখের ন্যায় বেহেশ্‌তকেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে নেক লোকদের জন্য অগণিত ও অকল্পনীয় শান্তির সামগ্রী ও নেয়ামত মওজুদ আছে। যে একবার বেহেশ্‌তে যাবে, তার আর কোন ভয় বা ভাবনা থাকবে না এবং কোন দিন তাকে বেহেশ্‌ত থেকে বের হতে হবে না। বরং চিরকাল সেখানে জীবিত অবস্থায় থেকে সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে। বেহেশতের সকল নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নেয়ামত। যদিও দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে না, কিন্তু মুমিনগণ বেহেশ্‌তের মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবেন। বেহেশ্‌তের মধ্যে বাগ-বাগীচা, বালাখানা, হুর-গিলমান, বিভিন্ন রকম নহর ও নানা রকম অকল্পনীয় সুস্বাদু খাদ্য-সামগ্রী সর্বদা মওজুদ থাকবে। জান্নাতীদের দিলের মধ্যে কোন নেয়ামত ভোগ করার ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ হবে।

দুনিয়াতে কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশ্য কুরআন-হাদীসে যাদের নাম নিয়ে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা যাবে। তবে কারোর ভাল আমল বা ভাল আখলাক দেখে তাকে ভাল মনে করা উচিত।

৬। তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে–মনে-প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্ব জগতে ভাল বা মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন

www.nagorikpathagar.org

বই হয়; তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। ক্ষমতা সর্বব্যাপী। তার ক্ষমতা ছিন্ন করে বের হতে পারে, এমন কেউ নেই। সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত সব কিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন।

ানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান ছেন এবং ইচ্ছা শক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় াপ ও পূণ্যের কাজ করে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট এবং র কাজ করলে সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা। তো সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার া আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। মানুষ জীবন ভর যতই ভাল বা থাকুক না কেন, কিন্তু যে অবস্থায় তার ইন্তিকাল হবে, সে হিসেবে শান্তি বা পাবে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাজীবন মুমিন ছিল, মউতের পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক ী বা শিরকী কথা বললো বা ঈমান বিরোধী কাজ করল, তাহলে সে কাফির স্ত হবে। তেমনিভাবে কোন কাফির মউতের পূর্বে ঈমান আনলে, সে মুমিন স্ত হবে। সুতরাং দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা ও গযবের ভয় রাখা ী। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা কিছু আদেশ ছেন বা নিষেধ করেছেন, সবই বান্দাহর আয়ত্তে ও ইখতিয়ারে।

মাল্লাহ তা'আলার উপর কোন কিছু করা ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু দান ন, সবই তার রহমত এবং মেহেরবানী মাত্র। তার উপর কারো কোনরূপ দাবী কুম কিংবা কর্তৃত্ব চলে না। ছোট হতে ছোট গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতে ন এবং বড় থেকে বড় পাপও তিনি মার্জনা করতে পারেন। সবই তাঁর ধীন। তিনি কাউকে দোযখে দিলে, সেটাই ইনসাফ এবং কাউকে জান্নাতে া করালে, সেটা তাঁর রহমত। আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

৭। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান

ৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে–আমাদের ান জীবন পরীক্ষার নিমিত্ত। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় ত করে এজীবনের সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন। মৃত্যুর পর একটি রয়েছে র সাময়িক ফলভোগের বরযখী জিন্দেগী, আর পরবর্তীতে কিয়ামত সংঘটিত ার পর আসবে পরকালীন আসল জিন্দেগী। পূর্ণাঙ্গ হিসাব-কিতাবের পর বান্দার নির্ণীত হবে বেহেশত বা দোযখের সেই অনন্ত জিন্দেগী।

কিয়ামতের পূর্বেই মুনকার-নকীরের প্রশ্নোত্তরের পর কবরের ভিতরে

www.nagorikpathagar.org

নেককারদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা এবং বদকারদের জন্য আযাব শুরু হয়ে যায়। কবর দ্বারা উদ্দেশ্য–আলমে বরযখ অর্থাৎ দুনিয়ার যিন্দেগী ও আখিরাতের যিন্দেগীর মধ্যবর্তী যিন্দেগী। সকল মানুষ ইন্তিকালের পর সেখানেই পৌঁছে যায়, চাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না-ই হোক। যেমন, অনেককে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে, কতেককে আগুনে জ্বালানো হয়, তারাও সেখানে উপস্থিত হয়। কবর বলে মূলতঃ এ জগতকেই বুঝানো হয়। নেক লোকদের জন্য কবর জান্নাত বা বেহেশ্‌তের একটা অংশ হয়ে যায়। তারা সেখানে আরামের সাথে অবস্থান করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে বা কিছু সদকা করলে, সে তা পেয়ে খুব খুশী হয় এবং তাতে তার বড়ই উপকার হয়।

উল্লেখ্য, ঈমানে মুফাস্‌সালের এ অংশটি ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং ৫নং বিষয় অর্থাৎ কিয়ামতের উপর ঈমান আনারই একটি স্তর; কিন্তু বিষয়টি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালোভাবে বুঝানোর লক্ষ্যে আলাদা ধারার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হল সহীহ্ ঈমানের সাতটি আরকান এবং তার কিছুটা ব্যাখ্যা ও তাফসীর। যে কোন ব্যক্তি এসব কথার সবগুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী আ'মালে সালিহা করবে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে তাকে বলা হবে পরিপূর্ণ মুমিন ও মুসলিম। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা যে, তাকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখিরাতে ইজ্জত ও শান্তির সাথে রাখবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সকল প্রকার আযাব-গযব ও কষ্ট-পেরেশানী থেকে হিফাজত করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে হিফাজত করে তাকে আল্লাহ্‌র পূর্ণ সন্তুষ্টির সংবাদসহ মহাসুখের আবাস ও আনন্দের স্থান জান্নাত দান করবেন।

আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত কথাগুলোর সবগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস তো করে, কিন্তু অলসতা বা গাফলতির কারণে কথাগুলোর দাবীর উপর আমল করে না বা আংশিকভাবে আমল করে, তাকে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বা গুনাহ্‌গার মুমিন বলা হয়। তার গুনাহ্ সমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাবও দিতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি তার ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে যাবে; সরাসরিও যেতে পারে, অথবা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করবে, অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে, অথবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ বের করবে,

www.nagorikpathagar.org

।ন থাকবে না। বরং সে কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব থেকে
ন থেকে থাকে, তারপরে তার থেকে এ ধরণের অপরাধ প্রকাশ পায়,
তাকে মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) বলা হবে–যদিও সে মুসলমান হওয়ার দাবী
বং যদিও সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, মাথায় টুপি ও
ড়ি রাখে বা হজ্জ-উমরা পালন করে। কারণ, এ কাজগুলো নেক আমল।
উ নেক আমল করলেই সে মুমিন গণ্য হয় না। যেমন, নবী (সাঃ)-এর
অনেক মুনাফিক (অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাফির) ছিল, তারা নবী (সাঃ)-এর সাথে
নক কাজে অংশ গ্রহণ করত। এমন কি জিহাদেও শরীক হতো। তারপরও
মিন বলে গণ্য হয়নি।

তঃ ঈমান ভিন্ন জিনিষ এবং আমল ভিন্ন জিনিষ। সহীহ্ ঈমানের সাথে
দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা পৌঁছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা
কারণ, এমন ঈমানদার–যার নিকট নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময়
প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা
নও যেমন–তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে ইত্যাদি,
াখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোন কাজে আসবে না। এসকল
পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিত্‌না-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা
য়। হাদীস শরীফে আছে–ফিতনার যমানায় অনেক মানুষ সকালে মুমিন
বিকালে কাফির হয়ে যাবে। (তিরমিজী, ২ঃ ৪৩, মুসলিম, ১ ঃ ৭৫) অর্থাৎ
রা ইলমে দ্বীন শিখবে না, হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে
রদিকে বদদ্বীনীর সয়লাব ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হবে, এমনকি দ্বীনের নামে
ও শিরকের প্রচার করা হবে; তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দ্বীন মনে করে
রে কাফির হয়ে যাবে। (আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করুন।)

ধন দেখতে হবে, এসব সহীহ্ আকীদা ও বিশ্বাস মুসলমানগণ কতটুকু ধরে
হ এবং কতটুকুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সহীহ্ আকীদাকে বিগড়ে
ছ। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বর্ণনার আশা
তবে তার পূর্বে ঈমানের বিবরণ আরো সবিস্তরে উপলব্ধির জন্য ঈমানের ৭৭
বর্ণনা করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমানের সাতাত্তর শাখা

আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَاِذَامَا اُنزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا ، فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ০

"যখন কোন সূরাহ্ অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরাহ্ তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? বস্তুতঃ যারা ঈমানদার, এ সূরাহ্ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।" (সূরাহ্ তাওবা ঃ ১২৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَاِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُه زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

"যখন তাদের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।" (সূরাহ্ আনফাল ঃ ২)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, তার মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে; অর্থাৎ ঈমানের নূর, আস্বাদ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, "ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি শ্বেত বিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেত বিন্দু ততই সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়।" (তাফসীরে মাযহারী, ৪ঃ ৩২৬ পৃঃ, মা'আরিফুল কুরআন, ৪ঃ ৪৯৪ পৃঃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন– "ঈমানের সত্তরের উপর শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হল, (দিলের বিশ্বাসের সাথে) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হল, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা।" (মিশকাত শরীফ, ১ ঃ ১২ পৃঃ)

এখানে ঈমানের শাখাসমূহকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে সকলেই

www.nagorikpathagar.org

ঈমানকে ক্রমশঃ বাড়াতে এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে পারেন।

ঈমান ও ইসলাম কতগুলো কার্যের সমষ্টির নাম। সেই কার্যাবলীর মধ্যে কতগুলো দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কতগুলো জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং কতক শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মোট কার্য ৭৭টি। তন্মধ্যে দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি, জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি এবং হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০টি কাজ—যা দিলের দ্বারা সমাধা হয়

(১) আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করা

আল্লাহ্কে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়নের অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়; বরং অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, নিরাকার, তা স্বীকার করা, তার সিফাত অর্থাৎ মহৎ গুণাবলী স্বীকার করা এবং তিনি যে এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ও দয়াময়—এটাও স্বীকার করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়—একথা বিশ্বাস করা কর্তব্য।

(২) সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট—এর উপর ঈমান রাখা

মুসলমানগণের অকাট্য বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে যে, ভাল-মন্দ ছোট-বড় সমস্ত বিষয় ও বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

(৩) ফেরেশ্তা সম্বন্ধে ঈমান রাখা

ফেরেশ্তাগণ নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহ্র প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দাহ্। কোন কাজেই তাঁরা বিন্দুমাত্র নাফরমানী করেন না এবং তাঁদের আল্লাহ্প্রাপ্ত ক্ষমতাও অনেক বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর অনেক জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন।

(৪) আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এরূপ ঈমান রাখতে হবে যে, এ মহান কিতাবটি কোন মানুষের রচিত নয়; বরং তা আদ্যোপান্ত আল্লাহ্ তা'আলার কালাম বা বাণী। পবিত্র কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অকাট্য সত্য। এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেসব বড় বা ছোট কিতাব নাযিল হয়েছিল, সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও অকাট্য ছিল। অবশ্য পরবর্তী কালে লোকেরা ঐসব কিতাব বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআন শরীফকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিতরূপে সংরক্ষণ করার ভার স্বয়ং আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলাই নিয়েছেন। সেই হিসেবে পবিত্র কুরআন অবিকল নাযিলকৃত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।

(৫) পয়গাম্বরগণ সম্বন্ধে ঈমান রাখা

বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নবী বা পয়গাম্বর বহু সংখ্যক ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ও বে-গুনাহ ছিলেন। তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে গিয়েছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর আনীত শরীয়তই আমাদের পালনীয়।

(৬) আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান রাখা

আখিরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ এই যে, কবরের সুওয়াল-জওয়াব ও ছাওয়াব–আযাব বিশ্বাস করা, হাশরের ময়দানে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষ একত্রিত হবে, নেকী-বদী পরিমাপ করা হবে ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ ক্বিয়ামত সম্বন্ধে যত কথা কুরআন ও হাদীস শরীফে এসেছে, সব বিশ্বাস করা জরুরী।

(৭) তাক্‌দীর সম্বন্ধে ঈমান রাখা

তাক্‌দীর সম্বন্ধে কখনও তর্ক-বিতর্ক করবে না, বা মনে সংশয়-সন্দেহ স্থান দিবে না। দুনিয়াতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সবই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন ও হুকুমের তাবেদার। আল্লাহ পাকের ক্ষমতায়ই সব কিছু হয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও কাজের ইখতিয়ার দিয়েছেন। মানুষ নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ভাল-মন্দ যা কিছু করবে,আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন।

(৮) বেহেশ্‌তের উপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বেহেশতের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ পাক নেক্‌কার মুমিন বান্দাহদেরকে বেহেশতে তাঁদের আমলের যথার্থ প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন। তারা ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে চিরকাল বেহেশ্‌তের অফুরন্ত নেয়ামত ও শান্তি ভোগ করবেন। বেহেশতের বাস্তবতা সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

(৯) দোযখের উপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দোযখের উল্লেখ আছে। আল্লাহ পাক কাফির, ফাসিক-ফাজির ও বদকারদেরকে জাহান্নাম বা দোযখে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত পরিণাম বা শাস্তি দিবেন। কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর গুনাহগার ঈমানদাররা জাহান্নামে নির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে যাবে। দোযখের বাস্তবতার উপর ঈমান রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১০) অন্তরে আল্লাহর মহব্বত রাখা

ন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি সর্বদা মহব্বত বদ্ধমূল রাখতে হবে। এমনকি র সবকিছু থেকে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত বেশী হতে হবে। মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "যারা মুমিন, হর প্রতি তাঁদের মহব্বত সর্বাধিক প্রকট।"

১১) আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সহিত দোস্তি ও দুশমনী রাখা

যরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন–"যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের দ অনুভব করতে পারবে ঃ

ক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)কে সর্বাধিক মহব্বত করবে।

খ) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে মহব্বত করতে হলে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই া। অন্য কোন উদ্দেশ্যে করবে না।

গ) কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মন্দ জানতে হলে, শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই মন্দ ব।" (মুসনাদে আহ্মাদ)

১২) রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি মহব্বত রাখা, সুন্নাতকে ভালবাসা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত রাখা ঈমানের বিশেষ শাখা। এর অর্থ শুধু তের দাবী করা বা না'ত-গযল পড়া নয়, বরং এর সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্তব্য ন করতে হবে। যথা ঃ

১. অন্তরের দ্বারা রাসূল (সাঃ)কে ভক্তি করতে হবে।

২. বাহ্যিকভাবে তাঁর আদব-তা'জীম রক্ষা করতে হবে।

৩. রাসূলের (সাঃ) উপর দরূদ ও সালাম পড়তে হবে।

৪. রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত তরীকার পায়রবী করতে হবে।

(১৩) ইখ্লাসের সহিত আমল করা

যে কোন নেক কাজ খালিসভাবে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার নিয়তে করা নের দাবী। নিয়ত খালিস হবে, মুনাফিকী ও রিয়া থাকতে পারবে না। মুমিনের ন কাজ একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যই হতে হবে।

(১৪) গুনাহ্ থেকে তাওবা করা

তাওবা শুধু গদবাঁধা কতগুলো শব্দ উচ্চারণের নাম নয়; বরং গুনাহ্র কারণে তপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পরহেয অবলম্বন করা জরুরী। এক আরবীতে অতি সংক্ষেপে তওবার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন– اَلتَّوْبَةُ تَحَرُّقُ الْحَشَا عَلٰى "গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলাকেই

www.nagorikpathagar.org

তাওবাহ বলে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন– اَلنَّدَامُ تَوْبَةٌ "অনুতাপের নামই তাওবা।"

(১৫) অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রাখা

হযরত মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়াত আছে যে, "ঈমান ওয়ালার দিল্ কখনও খোদার ভয় ছাড়া থাকে না, সব সময়ই তা আল্লাহ্র ভয়ে কম্পমান থাকে। কোন সময়ই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।" (হিলইয়া)

(১৬) আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করা

কুরআন শরীফে আছে ঃ "যারা কাফির, তারাই শুধু আল্লাহ্ পাকের রহমত হতে নিরাশ হয়।" আল্লাহর রহমতের আশা রাখা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(১৭) লজ্জাশীলতা বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الاِيْمَانِ "লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় শাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)

(১৮) শোক্রগুযার হওয়া

শোক্র দুই প্রকার ঃ (ক) আল্লাহ্র শোক্র আদায় করা, যিনি প্রকৃত দাতা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "আমার শোক্র কর, নাশোক্রী করো না।"

(খ) মানুষের শোক্র আদায় করা। অর্থাৎ যাদের হাতের মাধ্যম হয়ে আল্লাহ পাকের নেয়ামত পাওয়া যায়, তাদের শোক্র করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের শোক্র আদায় করল না, সে আল্লাহর শোক্র করল না।"

(১৯) অঙ্গীকার রক্ষা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ "হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার পূর্ণ কর।"(অর্থাৎ কাউকেও কোন কথা দিয়ে থাকলে, তা রক্ষা কর।)

(২০) সবর বা ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যারা সবর করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে (সহায়) আছেন।"

(২১) তাওয়াজু অর্থাৎ নম্রতা অবলম্বন করা

নম্রতা অর্থ–নিজেকে নিজে সকলের তুলনায় অন্তর থেকে ছোট মনে করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (বাইহাকী)

(২২) দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হওয়া

আবু হুরাইরা (রাঃ) রিওয়ায়াত করেন, নবীজী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

র থেকেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।" (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী শরীফ)।

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা

াের সন্তুষ্ট থাকাকে 'রিযা বিল-কাযা' বলে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সকল ন্তুষ্টিচিত্তে গ্রহণ করা। আল্লাহ্‌র হুকুমে বিপদ-আপদ বা দুঃখ-কষ্ট আসলে হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মনে কষ্ট লাগতে দিবে না, পেরেশানও হবে র বিষয়ে কষ্ট লাগাইতো স্বাভাবিক। তবে আসল কথা হচ্ছে–কষ্ট বুদ্ধির দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা তার মধ্যে কল্যাণ আছে এবং এটা আল্লাহ্‌ হুকুমে হয়েছে মনে করে সেটাকে পসন্দ করবে।

তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা

তা'আলা বলেছেন ঃ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ "যাদের ঈমান আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলারই উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা উচিৎ।"

অহংকার না করা

ার না করা অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজে ভাল এবং বড় মনে না নর অঙ্গ। তিবরানী নামক হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে– নিষ মানুষের জন্য সর্বনাশকারী ঃ

লোভ, যে লোভকে না সামলিয়ে বরং মানুষ তার অনুগত হয়।

ফসানী খাহেশ, যে নফসানী খাহেশকে দমন না করে বরং তার চাহিদা াজ করা হয়।

াহংকার-তাকাব্বুর বা অন্যের তুলনায় নিজেকে ভাল ও বড় মনে করা।"

চোগলখুরী, কীনা ও মনোমালিন্য তরক করা

ল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "চোগলখুরী ও কীনা মানুষকে দোযখে নিয়ে ফেলে। কান মুমিনের দিলেই এ গর্হিত খাসলত থাকা উচিৎ নয়।" (তিবরানী)

হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা

ল্লাহ্‌ (সাঃ) ইরশাদ করেন, "অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে ফেলে, তদ্রূপ ানুষের নেকীকে ভস্ম করে ফেলে। অতএব, খরবদার! খবরদার!! খনো হিংসা-বিদ্বেষ করবে না।" (তিবরানী)

ক্রোধ দমন করা

় তা'আলা কুরআন শরীফে ক্রোধ দমনকারীদের প্রশংসা করেছেন। াগ করা গুনাহ্‌। রাগ-ক্রোধ দমনে হাদীসে তাকীদ এসেছে। তবে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আঘাত আসলে, সেখানে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রদর্শনই ঈমানের দাবী।

(২৯) অন্যের অনিষ্ট সাধন ও প্রতারণা না করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন–"যে অন্যের ক্ষতি করে অর্থাৎ পরের মন্দ চায়, অপরকে ঠকায়, ধোকা দেয়, তার সাথে আমার কোন সংশ্রবই নেই।" (মুসলিম)

(৩০) দুনিয়ার অত্যধিক মায়া-মহব্বত ত্যাগ করা

হযরত নবী করীম (সাঃ) ফরমায়েছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, তার আখিরাতের লোকসান হবে এবং যে আখিরাতকে ভালবাসবে, তার দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হবে। হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালবেসে চিরস্থায়ী আখিরাতকে নষ্ট করে দিও না। তোমরা সকলে চিরস্থায়ী পরকালকেই শক্তভাবে ধর এবং বেশী করে ভালবাস। (অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে আমলের প্রতি যথাযথ ধাবিত হও।)" (আহমদ ও বাইহাকী)

ঈমান সংশ্লিষ্ট সাতটি কাজ–যা জবানের দ্বারা সমাধা হয়

(৩১) কালিমা পড়া

কালিমার অর্থ–আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বান্দাহর অঙ্গীকারের কথা দিলে বিশ্বাস করার সাথে মুখে স্বীকার করা। ইমাম আহমদ (রহঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তোমরা ঈমান তাজা করতে থাকবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান তাজা করতে হবে কেমন করে? হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, খুব বেশী করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা পড়তে থাকবে।" (আহমাদ)

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে রিওয়ায়াত আছে, হুযূর (সাঃ) ফরমায়েছেন, "মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত (মুমূর্ষু) লোকদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা তালকীন দাও। (মুসলিম)

এতদ্ব্যতীত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার ফজীলত সম্বন্ধে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমানের পাশাপাশি মুখে তাঁর প্রকাশই রয়েছে কালিমার ভিতর।

(৩২) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাক। কেননা, যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন স্বয়ং

www.nagorikpathagar.org

মান শরীফ তাদের জন্য শাফা'আত করবে।" (মুসলিম)

(৩৩) দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যার ভাল করার ইচ্ছা করেন, ক দ্বীনের ইল্‌ম ও কুরআনী জ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন–"ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ।" (ইবনে মাজাহ্)

আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকার কারণে এবং উস্তাদের কাছে হাদীস না পড়ার ণ অনেকে এই হাদীসের দ্বারা আধুনিক বিদ্যার নামে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানের া জড় জগতের জ্ঞান লাভের অর্থ বুঝে এবং বুঝিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও াড়া ব্যাখ্যা। এখানে ইল্‌ম দ্বারা একমাত্র দ্বীনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

(৩৪) দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন–"কারো নিকট কোন ইল্‌মের কথা জিজ্ঞাসা হলে (অর্থাৎ শিক্ষা প্রার্থী হলে), সে জানা সত্ত্বেও যদি তা প্রকাশ না করে র্থাৎ শিক্ষা না দেয়), তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের াম পরিয়ে (শাস্তি) দিবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

অন্য হাদীসে এসেছে, দ্বীন শিক্ষাদানকারীর জন্য আসমান ও যমীনের সকল লূক দু'আ করতে থাকে। (তিরমিজী শরীফ ও মিশকাত শরীফঃ ১, পৃঃ ৩৪)

তাই আল্লাহ পাক যাকে দ্বীনী ইল্‌ম দান করে সৌভাগ্য মন্ডিত করেছেন, তার ব্য হচ্ছে–অন্যকে সেই ইল্‌ম শিখানো।

(৩৫) আল্লাহর নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াত করেন–রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মায়েছেন–"দু'আ ইবাদতের মগজ।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও ফরমায়েছেন, "আল্লাহর নিকট দু'আ চাওয়ার মত াবান জিনিষ আর নেই। অর্থাৎ বান্দাহ্ যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চায়, া আল্লাহ তা'আলা বড়ই সন্তুষ্ট হন।" (তিরমিযী)

তাই আল্লাহ্ পাকের কাছে দু'আ করতে হবে, হাজত চাইতে হবে।

(৩৬) আল্লাহর যিকির করা

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াত করেন–প্রিয়নবী (সাঃ) মায়েছেন ঃ "যে আল্লাহর যিকির করে, সে জীবিতের ন্যায় এবং যে যিকির না া, সে মৃত তূল্য।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

www.nagorikpathagar.org

রাসূলে আকরাম(সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ"বিভিন্ন জিনিষের ময়লা দূর করার জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা ও যন্ত্র আছে; দিলের মলীনতা দূর করার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকির।" (বাইহাকী)

(৩৭) বেহুদা কথা হতে জবানকে রক্ষা করা

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন–রাসূলে কারীম (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "আমার জন্য যে ব্যক্তি দু'টি জিনিষের যিম্মাদার বা যামিন হবে ঃ এক. যা তার ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে আছে (অর্থাৎ জিহ্বা), দুই. যা তার উরুদ্বয়ের মাঝে আছে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান), আমি তার জন্য বেহেশ্‌তের যামিন ও যিম্মাদার হব।" (বুখারী)

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৪০টি কাজ–যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা সমাধা হয়

বাহ্যিক অংগ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি কার্য সমাধা হয়। তন্মধ্যে ষোলটি কাজ নিজেই করতে হয়, ৬টি নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয় এবং ১৮টি অন্যান্য জনসাধারণের সঙ্গে করতে হয়। বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬টি কাজ–যা নিজে নিজেই করতে হয়

(৩৮) পাক-সাফ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "ত্বাহারত (পাক-সাফ থাকা) ঈমানের অর্ধেক।" (মুসলিম শরীফ)

(৩৯) নামায কায়িম করা

রাসূলে কারীম (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "তোমাদের ছেলে-মেয়েদের বয়স যখন সাত বৎসর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্য আদেশ কর। দশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যদি তারা নামায না পড়ে, তবে তাদেরকে হাতের দ্বারা শাস্তি দিয়ে নামায পড়াও। আর তাদের শয়নের বিছানা পৃথক করে দাও, অর্থাৎ যখন তাদের কিছু জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তখন তাদের পৃথক বিছানায় শুতে দাও।" (আবু দাউদ)

নামায পড়ায় প্রভূত ফজীলত ও ছাওয়াব এবং নামায তরক করায় কঠিন শাস্তি ও আজাব সম্বন্ধে কুরআনের বহু আয়াত ও প্রচুর হাদীসের বর্ণনা এসেছে।

(৪০) যাকাত দেয়া

আবু হুরাইরা (রাঃ) রিওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে মাল দান করেছেন, তারা যদি যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মালের দ্বারা অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ বানানো হবে এবং সে সাপ তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী শরীফ)

www.nagorikpathagar.org

১) রোযা রাখা

যার ফজীলত সম্বন্ধে এবং রোযা ছাড়লে যে কত বড় গুনাহ্ হয়, সে বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "ইচ্ছাপূর্বক নের একটি রোযা ছেড়ে দিলে, সারাজীবন রোযা রেখেও তার ক্ষতিপূরণ া।" (বুখারী শরীফ)

২) হজ্জ করা (উমরা পৃথক আমল হলেও তা হজ্জেরই একটি পর্যায়)

বু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে রিওয়ায়াত আছে, নবী করীম (সাঃ) ছেন ঃ "গরীব হওয়া, বাদশাহ্র জুলুমগ্রস্ত হওয়া, কিংবা রোগাক্রান্ত হওয়া া কারণে হজ্জ করতে না পারলে, তাতে গুনাহ হবে না;) এই তিন প্রকার ঘ্নের কোন একটিও না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ না করবে, তার ইচ্ছা, ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক, অথবা নাসারা হয়ে মারা যাক। (অর্থাৎ মুসলমান তার মৃত্যু শংকামুক্ত নয়।) (দারিমী)

শ্য রোগাক্রান্ত ধনী ব্যক্তির হজ্জ মাফ হবে না, রোগমুক্তির সম্ভাবনা না তার উপর হজ্জে বদল করানো জরুরী।

৩) ই'তিকাফ করা

রত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) রিওয়ায়াত করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আল্লাহ া যাবৎ ওফাত না দিয়েছেন, তাবৎ তিনি সর্বদা রামাজান শরীফের শেষ দশ 'তিকাফ করতেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সম্মানিতা বিবিগণ ফ করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪) হিজরত করা

ান বাঁচানোর জন্য স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয় ' 'হিজরত' বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "হিজরতের কারণে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।" (মুসলিম)

৫) নযর (মান্নত) পুরা করা

ূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে আল্লাহ্র ফরমাবরদারী করার নযর) মানবে, তার সে নযর-মান্নত পুরা করতে হবে; কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র ানী করার মান্নত মানে, তাহলে সেই মান্নত পুরা করা যাবে না। এ ধরনের করা গুনাহ। (বুখারী শরীফ)

৬) কসম রক্ষা করা

বিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ "কসম খেলে তা রক্ষা

www.nagorikpathagar.org

কর।" (অর্থাৎ কসম খেলে, তা ঠিক রাখা অথবা কসম ভঙ্গ হলে, তার কাফ্ফারা দেয়া কর্তব্য)। (সূরাহ্ মায়িদা ঃ ৮৯)

(৪৭) কাফ্ফারা আদায় করা

কাফ্ফারা চার প্রকার, যথা ঃ (ক) কসমের কাফ্ফারা, (খ) ভুল বশতঃ খুনের কাফ্ফারা, (গ) বিবির সাথে যিহার করার কাফ্ফারা, (ঘ) রামাজানের রোযার কাফ্ফারা। এ সকল ব্যাপারে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে গেলে, তৎক্ষণাৎ কাফ্ফারা আদায় করা ঈমানের দাবী।

(৪৮) সতর ঢাকা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "আল্লাহ পাকের উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর যে ঈমান রাখে, সে যেন কাপড় পরে হাম্মামে (গোসলখানায়) যায়, অর্থাৎ মানুষদের সম্মুখ দিয়ে সতর খুলে না যায়।" (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা সতর ঢাকার গুরুত্ব বুঝা যায়।

(৪৯) কুরবানী করা

যায়িদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত আছে, "একদা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি জিনিষ? হুযূর (সাঃ) বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরীকা। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হুযূর! আমরা এর প্রতিদান কি পাব? হুযূর (সাঃ) ফরমালেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাবে। (ইবনে মাজা)

কুরবানীর ফজীলত সম্বন্ধে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

(৫০) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা

হযরত জাবির (রাঃ) রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলে কারীম (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "যখন তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাইকে কাফন দাও, তখন ভালভাবে কাফন দিবে।" (মুসলিম)

(৫১) ঋণ শোধ করা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রিওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারলে, সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়; কিন্তু পরের ঋণ অর্থাৎ বান্দাহর যে কোন প্রকার হক মাফ হয় না।" (মুসলিম)

সুতরাং খুব বেশী জরুরী দরকার ও একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করাই অনুচিত। তারপরেও ঠেকায় পড়ে ঋণ করলে, ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথেই তা

www.nagorikpathagar.org

ধ করে দেয়া ঈমানের দাবী। যাতে করে করজদাতাকে কষ্টে না ফেলা হয়। লমান ভাইগণ! পরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা বড় মারাত্মক কথা। চিন্তা করে শহীদের মর্তবা হতে বড় মর্তবা আর কার হতে পারে? অথচ তার সকল গুনাহ্ মাফ হলেও বান্দাহ্র হক মাফ হবে না।

২) ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা

ূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "সত্যবাদী খাঁটি বিশ্বস্ত কারবারী-ব্যবসায়ী । ময়দানে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গী হবে।" (তিরমিযী)

৩) সত্য সাক্ষ্য দেয়া

ল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ
াক্ষ্য গোপন করো না (অর্থাৎ সত্য ঘটনা জেনে তা লুকিয়ে রেখো না।) যে য়ে রাখবে, তার আত্মা পাপিষ্ঠ।" (সূরাহ্ বাক্বারা ঃ ২৮৩)
ত্য ঘটনা জেনেও প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য না দিয়ে গোপন করা দুরুস্ত নয়।

মান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ-যা আপনজনের সঙ্গে সপৃক্ত

৪) বিবাহের দ্বারা চরিত্র রক্ষা করা

সূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর পাষণের বন্দোবস্ত করতে পারে, তার বিবাহ করা উচিৎ। কেননা, বিবাহ চক্ষুর হিফাজত হয় এবং কাম রিপুও দমন হয়। " (বুখারী ও মুসলিম)

৫) পরিবারবর্গের হক আদায় করা

ূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "নিজের পরিবার-পরিজনের জরুরত পূর্ণ জন্য খরচ করাই মালের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার"। (মুসলিম শরীফ)
জের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও চাকর-নওকর, গোলাম-বাঁদী ইত্যাদিও ভূক্ত। পরিবার-পরিজনের হক শুধু তাদের খাওয়ানো, পরানো আর স্বাস্থ্যবান ড়ে তোলার নাম নয়, বরং তাদের কুরআন-হাদীস ও দ্বীনী বিষয়ে শিক্ষাদান রিত্রবান করতে চেষ্টা করা, কুকর্ম, কুসংসর্গ, কুশিক্ষা হতে বাঁচিয়ে রাখা াদের সাথে নরম ব্যবহার করাও তাদের হক (প্রাপ্য)। এ হক আদায় করা র শাখা।

৬) পিতামাতার খিদমত করা

ূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—"পিতা-মাতার খুশীতে আল্লাহর খুশী এবং

www.nagorikpathagar.org

পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।" (তিরমিযী)

অন্য হাদীসে আছে, সন্তান পিতা-মাতার চেহারার দিকে মহব্বতের নজরে একবার তাকালে, তার আমল নামায় একটি কবুল হজ্জের ছাওয়াব লিখা হয়।

(৫৭) সন্তান লালন-পালন করা

সন্তানদেরকে দ্বীনী ইল্‌ম ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়াও লালন-পালনভূক্ত একটি দায়িত্ব। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন—"যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হবে, আর সে তাদেরকে যত্নের সাথে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করবে, সে নিশ্চয় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।" (আল-আদাবুল মুফরাদ লিল-বুখারী)

(৫৮) আত্মীয়তা রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে, সে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

আত্মীয় বলতে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, ভাতিজা-ভাতীজী, ভাগিনা-ভাগিনী, মামু-খালা, নানা-নানী, দাদা-দাদী ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভূক্ত।

(৫৯) মনিবের ফরমাবরদার হওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "গোলাম যদি মনিবের অনুগত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দেয়া হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ—যা অন্য লোকদের সহিত সম্পৃক্ত

(৬০) ন্যায় বিচার করা

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, তন্মধ্যে 'ন্যায় বিচারক' একজন।" (বুখারী ও মুসলিম)

(৬১) জামা'আতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে যে পাঁচটি কাজের হুকুম করেছেন, তোমাদের আমি সে পাঁচটি কাজের হুকুম করছি ঃ (ক) ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের) আদেশ শ্রবণ করা। (খ) সে আদেশ খুশীর সাথে পালন করা। (গ) দ্বীন প্রচার করা এবং দ্বীন প্রচারার্থে জিহাদ করা। (ঘ) দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে হিজরত করা বা স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা। (ঙ) খাঁটি মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

'আতের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা। যে জা'মাআত ছেড়ে অর্ধ হাত াণও দূরে সরে পড়েছে, সে ইসলামের রজ্জুকে গর্দান হতে ফেলে দিয়েছে।" মিযী) সুতরাং তার আকীদা বা মতবাদ কোন ক্রমেই গ্রহণ না করা যাবে না। ামা'আতের সঙ্গে থাকার অর্থ এই যে, আকায়িদ-আমলের ব্যাপারে আহলে । পায়রবী করবে। যে সকল হাক্কানী আলিম-উলামা ও দ্বীনদার মুসলমান ান-সুন্নাহ মতে চলেন, তারাই আহলে হক।

৬২) রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা

াসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আমি তোমাদের ওসীয়ত করছি-আল্লাহ তা'আলার াব সময় দিলে জাগরুক রেখো এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও খলীফা একজন া গোলাম হলেও তার আদেশ শ্রবণ করে তা পালন করো।" (আবু দাউদ) ্সলামী রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা জরুরী। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামী নীতি ধী কোন ফরমান জারী করেন, তা মানা জায়িয নয়।

৬৩) দু'পক্ষের কলহ মিটিয়ে দেয়া

াল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "কোন দুই দল মুসলমান যদি লড়াই-ঝগড়া তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এক্ষেত্রে যদি এক দল অন্য দলের অত্যাচার করে, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর-যাবৎ না তারা হর দিকে রুজু হয়।" (সূরাহ্ হুজুরাত ঃ ৯)

৬৪) সৎ কাজে পরস্পরে সহায়তা করা

াল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "সৎ কাজ ও পরহেযগারীর বিষয়ে একে অন্যের তা কর।" (সূরাহ্ মায়িদা ঃ ২)

াক্ষেপের বিষয়, আজকাল যদি কেউ পরহেযগারী অবলম্বন করে ধর্ম পালন শুরু করে, তবে তার সহায়তা করা তো দূরের কথা, তাকে উল্টো আরও বিদ্রূপ করা হয়। আর যদি কেউ কোন ভাল কিছু শুরু করে, তবে তৎসংশ্লিষ্ট বোঝা তারই মাথার উপর ফেলে রাখা হয় এবং সেই সৎ কাজকে তার গত ভেবে অন্যেরা তার কোন সহযোগিতা করতে চায় না। এটা উচিত নয়।

৬৫) 'আমর বিল-মারুফ ও নাহ্য়ি আনিল-মুনকার' করা

ামর বিল-মা'রুফ অর্থ-(নিজে সৎ কাজ করার পাশাপাশি) অপরকে সৎ র দাওয়াত দেয়া এবং নাহ্য়ি আনিল-মুনকার অর্থ-(নিজে অসৎ কাজ থেকে থাকার পাশাপাশি) অন্যকে অসৎ কাজে নিষেধ করা।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হওয়া আবশ্যক, যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকবে। তারা অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। (যারা এরূপ হবে,) তাদেরই (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) জীবন স্বার্থক ও সফলকাম।" (সূরাহ্ আলে ইমরান ঃ ১০৪)

(৬৬) হদ্ বা ইসলামী দন্ডবিধি কায়িম করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–"একটি হদ্ কায়িম করা চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা অধিক ভাল।" অর্থাৎ সুসময়ে চল্লিশ বার বৃষ্টি হলে, দেশে যত পরিমাণ বরকত আসে, একটি হদ্ কায়িম করলে তদাপেক্ষা অধিক বরকত আসে।

(ইবনে মাজা)

(৬৭) জিহাদ করা বা দ্বীন জারী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– "তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হল।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে"।

(আবু দাউদ শরীফ ও মিশকাত শরীফ ঃ ১,পৃ ঃ ১৮)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আখেরী উম্মতের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহ্‌র যমীনে দ্বীন কায়িমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদে অংশ গ্রহণ করে জান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা জরুরী।

(৬৮) আমানতদারী ও দিয়ানতদারী রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।" (বাইহাকী শরীফ ও মিশকাত শরীফ, ১ ঃ ১৫)

(৬৯) মানুষকে করজে হাসানা দেয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "দান করলে, দশগুণ ছাওয়াব পাওয়া যায়; আর করজে হাসানা দিলে, আঠার গুণ ছাওয়াব অর্জিত হয়।" (ইবনে মাজাহ্)

(৭০) পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর এবং কিয়ামত

www.nagorikpathagar.org

র উপর ঈমান বজায় রাখতে চায়, সে যেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ।র করে এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

।১) কারবারের মধ্যে সততা ও সদাচার অবলম্বন করা

সূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–"ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন ভীষণ প্রকৃতির রূপে উঠানো হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয় দিলে রেখেছে, সদাচারের সাথে কারবার করেছে এবং সত্য কথা বলেছে, তারা নাজাত পাবে।" (তিরমিযী)

।২) অর্থ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা

ল্লাহ তা'আলা বলেছেন–"অনর্থক অপচয় করো না" (সূরাহ্ 'আরাফ ঃ ৩১) ।ারী শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের কাজ পসন্দ করেন না ঃ অতিরিক্ত কথা বলা, অর্থের অপব্যবহার করা এবং ক্ত প্রশ্ন ও তর্ক-বাহাস করা"। (বুখারী)

।৩) সালামের জওয়াব দেয়া

ীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক আছে ঃ (ক) সালাম দিলে, জওয়াব দেয়া। (খ) রুগ্ন হলে, সেবা-শুশ্রূষা (গ) মৃত্যুবরণ করলে, কাফন-দাফন করা। (ঘ) ডাক দিলে বা দাওয়াত সে ডাকে সাড়া দেয়া। (ঙ) হাঁচি দিলে, জওয়াব দেয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

।৪) হাঁচি দাতার জওয়াব দেয়া

চি দাতার জওয়াব হচ্ছে–হাঁচি দাতা হাঁচি দিয়ে যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ।র শোকর আদায় করবে, তখন শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলে তাকে দিবে। হাঁচিদাতার জওয়াবে এ দু'আ দানের তাৎপর্য হচ্ছে, মুসলমান ভাইয়ের ব খুশী হওয়া এবংতার দুঃখে দুঃখিত হওয়া। অর্থাৎ এ দু'আর মাধ্যমে প্রকাশ চ্ছে যে, তার সামান্যতম খুশীতেও আমরা খুশী।

।৫) কাউকেও কোনরূপ কষ্ট না দেয়া

াসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন ঃ "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে হাতের দ্বারা, কথার দ্বারা, বা অন্য কোন ব্যবহারের দ্বারা কাউকেও কোনরূপ কষ্ট দেয় র্থাৎ সে কারো কোন ক্ষতি করে না।" (বুখারী)

।৬) অবৈধ খেলাধুলা ও রং- তামাসা হতে বেঁচে থাকা

সূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন, "তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যত খেলাধুলা

www.nagorikpathagar.org

আছে, সবই অনর্থক, অর্থাৎ পাপের কাজ। সে তিন প্রকার হচ্ছে ঃ জিহাদের জন্য তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করা, জিহাদের জন্য ঘোড়া দৌড়ানো শিক্ষা করা এবং স্ত্রীর মন রক্ষার্থে তার সাথে কিছু হাসি-রসিকতা করা। (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূর্ণ করার জন্য শক্তি ও সুস্বাস্থ্য জরুরী। সেই নিয়তে কিছু ব্যায়াম, শরীর চর্চা বা জায়িয খেলাধুলা অনর্থক কাজের মধ্যে শামিল নয়।

(৭৭) রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলা

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলাকে হাদীস শরীফে ঈমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "ঈমানের সত্তুরের উপরে শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হলো—"রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, এখন আমরা প্রত্যেকে নীরবে একটু চিন্তা করে দেখি, উল্লেখিত ঈমানের শাখাসমূহের কতগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে, আর কতগুলো হাসিল হয়নি। যেগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করি। আর যা এখনো হাসিল হয়নি, তা হাসিল করার জন্য হাক্কানী আলিমগণের পরামর্শ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমান হাসিল করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে তৎপর হই।

ঈমানের শাখা সম্বন্ধে এখানে অতি সংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্য হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর অমর গ্রন্থ 'ফুরূউল ঈমান' পাঠ করুন। এছাড়াও হযরত থানভী (রহঃ)-এর 'হায়াতুল মুসলিমীন', 'হুকূকুল ইসলাম', 'বেহেশতী যেওর', 'সাফাইয়ে মু'আমালাত' এবং তাঁর পছন্দনীয় ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর 'তা'লীমুদ্দীন' প্রভৃতি কিতাব সহীহ ইসলামী জিন্দেগী গঠন ও পরিপূর্ণ ঈমান ও আমল অর্জনের জন্য বড়ই উপকারী।

এ পর্যন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার বিবরণ পেশ করা হল। এ সকল ঈমান-আকীদার মধ্যে মানুষেরা যে পরিবর্তন করে ভ্রান্ত আকীদার জন্ম দিয়েছে, তা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে সেসব ভ্রান্ত আকীদা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা

হান আল্লাহ্ বলেন,

وَاَنَّ هَـذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

عَنْ سَبِيْلِهِ ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল। খবরদার! ্য পথ অবলম্বন করো না। অন্যথায় সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা সংযত ও সতর্ক হও।" (সূরাহ্ আন'আম ঃ ১৫৩)

বী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন–"নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত ল, তেমনিভাবে আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি জামা'আত ্ তাদের সকল ফিরকাই জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) প্রশ্ন ন, সেই জামা'আত কোন্‌টি? নবী (সাঃ) জওয়াব দিলেন– "আমি ও আমার গণের তরীকার উপর যারা থাকবে।" (তিরমিযী ও মিশকাত ঃ ৩০)

ল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আখিরী উম্মত ঈমান ও ার দিক দিয়ে ৭৩ ফিরকা বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে শুধু একটি জামা'আত জান্নাতী হবে এবং অবশিষ্ট ৭২টি ফিরকা ঈমান ও আকীদার কারণে জাহান্নামী হবে।

স্তবতার নিরিখে একথা প্রমাণিত যে, নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত য়েছে। উম্মতের মধ্যে বহু গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। এদের কোনটা সুস্পষ্ট কুফরী আকীদা অবলম্বন করার দরুণ দ্বীন ও ঈমানের গন্ডি সম্পূর্ণরূপে খারিজ হয়ে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। আর কোন কোনটা ত, গোমরাহ্ ও বিদ'আতী। তারা কাফির না হলেও নিশ্চিতভাবে আহ্‌লে ওয়াল জামা'আত বা আহ্‌লে হকের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

আহ্‌লে হক ভূক্ত কোন ব্যক্তি আকীদার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে না, তবে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ আমলের ত্রুটির কারণে সাময়িকভাবে জাহান্নামী হতে পারে। আর অবশিষ্ট বাতিল ফিরকাহ্ সমূহ আকীদা ও আমল উভয় প্রকার ত্রুটির কারণে জাহান্নামী হবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যে সহীহ্ ঈমান ও আকীদা উম্মতের সামনে পেশ করেছিলেন এবং যে নক্‌শার উপর সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীতে মুসলমান নামধারী অনেক লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং দ্বীনে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সহীহ্ আকীদা সমূহকে পরিবর্তন করে তার স্থলে ভ্রান্ত আকীদার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বানী প্রণিধানযোগ্য—"শেষ যামানায় অনেক দাজ্জাল-কাজ্জাবের আবির্ভাব ঘটবে; তারা দ্বীনের নামে এমন এমন কথা প্রচার করবে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারাও কোনদিন শুননি। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ্ না করে ফেলে।" (মুসলিম শরীফ)

প্রত্যেক যুগেই অনেক মূর্খ ও বে-ইলম লোকেরা ইসলামের নামে আবিষ্কৃত সেসব নতুন নতুন ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান নষ্ট করেছে এবং আহ্‌লে হকের জামা'আত থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে ফিতনা-ফাসাদ অনেক বেশী হওয়ায় এবং অধিকাংশ লোক দ্বীনী ইল্‌মের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় তাদের অনেকেই ইসলামের নামে সেসব বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে নিজেদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করে ফেলছে।

তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে যে পরিমাণ কিতাবপত্র রচনা ও যতটুকু আলোচনা—পর্যালোচনার দরকার ছিল, তা হয়নি। অপরদিকে মধুর নামে বিষ পান করানোর ন্যায় বাতিল আকীদায় ভরপুর বই-পুস্তকে বাজার ছেয়ে গেছে। বাতিল আকীদার প্রচার ও প্রসার হচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। এহেন মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের লক্ষ্যে সহীহ্ আকীদা বর্ণনার পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদা সমূহের আলোচনা অতীব জরুরী মনে করে সেগুলোর আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যাতে করে কোন মুসলমান দ্বীনের নামে সেসব আকীদা কোনক্রমেই অন্তরে স্থান না দেন। আর খোদা না করুন, যদি কোন মুসলমান সহীহ্ ইল্‌ম না থাকার দরুণ ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন সাথে সাথে সেগুলো অন্তর থেকে দূর করে খালিসভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে

www.nagorikpathagar.org

করে সহীহ্ আকীদা দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন।

বধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ জিদ বা হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া বাঞ্ছনীয় ন্বরে যাওয়ার পরই ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হবে। এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি উত্তীর্ণ তিনি সামনের সকল পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাতী হবেন। আর উক্ত ায় যে অকৃতকার্য হবে, সে সামনের সকল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ামী সাব্যস্ত হবে। আর এ পরীক্ষা একবারই হবে, দুনিয়ার পরীক্ষার ন্যায় র ফেল করে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ সেখানে নেই। আর এ । প্রত্যেককে দিতে হবে এবং যার পরীক্ষা তাকেই দিতে হবে। সেখানে ওলী-বুযুর্গ, পীর-আউলিয়া, রাজনৈতিক নেতা বা দলপতি কেউ কোন প্রকার ।-সহযোগিতা করে পাশ করিয়ে দিতে পারবে না। এ ধরনের কোন সুযোগ ন নেই। দুনিয়াতে কোন নেতার প্রভাবে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভ্রান্ত আকীদায় ী হয়ে পরকালে বুদ্ধি খাটিয়ে সঠিক উত্তর দিয়ে পাশ করে ফেলবে, এমন করাটাও একেবারে অর্থহীন। যে ব্যক্তি যে আকীদার উপর জীবন কাটিয়েছে য আকীদার উপর মৃত্যুবরণ করেছে, পরকালের পরীক্ষার সময় তদ্রূপ উত্তরই ুখ থেকে বের হবে এবং সেই উত্তরের উপরই ভিত্তি করে তার জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হবে। তাই সময় থাকতে এখনই যার যার ভ্রান্ত া ও আমলের ত্রুটি সংশোধন করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

র্তমান সমাজে যেসব ভ্রান্ত আকীদা প্রচলিত ছ, তন্মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে ত্ত হল। এথেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

ভ্রান্ত আকীদা সমূহ

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ান্ত আকীদা-১ ঃ ইসলামের নামে একটি গোমরাহ্ ফিরকা এরূপ া রাখে যে, আল্লাহ ও রাসূল একই সত্ত্বা বিশেষ। অর্থাৎ যিনি রাসূল, ই স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই 'মুহাম্মদ' নাম ধারণ করে মানুষের ততে দুনিয়ায় অবতরণ করেছিলেন। তারা আরো বলে থাকে যে, দ ও আহমদ-এর মধ্যে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। খোদা মীমের

www.nagorikpathagar.org

যবনিকা টেনে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ছুরত ধারণ করে লোকালয়ে এসেছেন। নচেৎ উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

এ কথাটি তারা কবিতার মাধ্যমেও বলে থাকে–

"মুহাম্মদ নাম ধারণ করে কে এলোরে মদীনায়,
আসল কথা বলতে গেলে পড়বে দড়ি এ গলায়।" (নাউজুবিল্লাহ)

এ ধরনের আকীদা সুস্পষ্ট কুফর। এরূপ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে যে বের হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয়। কোন সৃষ্ট জীবের সাথে কোনভাবেই তাঁর তুলনা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নবীকে সরাসরি খোদার সাথে তুলনা করা বা খোদা ও রাসূল (সাঃ)কে একই সত্ত্বা বলা যে কত বড় জঘন্য অপরাধ ও কুফরী আকীদা, তা অতি সহজেই অনুমেয়। (সূরাহ্ শূরাঃ ১১, আকীদাতুত্ ত্বাহাবী, পৃঃ ৩১)।

<u>ভ্রান্ত আকীদা–২</u> ঃ অনেক মূর্খ লোক বিশ্বাস করে যে, ওলী-বুযুর্গ, পীর-সাধক, মাযার-দরবার প্রভৃতি মানুষের মনের মাকসূদ পূর্ণ করতে পারে, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি দান করতে পারে এবং বিপদ-আপদ দূর করতে পারে। এ ভ্রান্ত আকীদার বশবর্তী হয়ে তারা বিভিন্ন পীরের নামে মান্নত ও নযর–নিয়ায করে, তাদেরকে বা তাদের মাযারকে সিজদা করে, তাদের কবর তাওয়াফ করে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে ইত্যাদি।

অথচ মান্নত বা নযর, সিজদা, বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও প্রার্থনা এ সবই ইবাদত এবং এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং এগুলো অন্যের জন্য করা কুফরী ও শিরকী কাজ। এর থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ এবং এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাকসূদ পূর্ণ করেন, তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের সকল বিপদ-আপদ দূর করতে পারেন। এ ক্ষমতা তিনি পীর-বুযুর্গ তো দূরের কথা, কোন নবী–রাসূলকেও প্রদান করেন নি। তাই কোন নবী-রাসূল, পীর–বুযুর্গ এ সব ক্ষমতার কথা কখনো দাবীও করেন নি, বা এগুলো বাস্তবায়িত করে দেখাতেও পারেন নি। বরং এসব ব্যাপারে তারাও আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হিসেবে তাঁদের অনেক দু'আ আল্লাহ পাক কবুল করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কবুল করেন নি। যেমন, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কাফির ছেলের জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন নি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের কাফির পিতার জন্য দু'আ করেছেন;

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন নি। আমাদের নবী (সাঃ) মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জন্য দু'আ করেছেন, নিজের চাচা আবু তালিব-এর জন্য দু'আ করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন নি। এ ধরনের অনেক ঘটনার বর্ণনা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

সুতরাং ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীন। কোন পীর-আউলিয়া বা মাযারের ইবাদত করা সম্পূর্ণ শিরক। এতে ঈমান চলে যায়। (সূরাহ্ 'আনআম, আয়াত ঃ ১৬৪, সূরাহ্ ইউসুফ, আয়াত ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, আকীদাতুত্ ত্বাহাবী পৃঃ ৩১)।

মোদ্দাকথা, কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ মা'বুদ কিংবা ইবাদতযোগ্য হতে পারে না। অতএব, যারা গঙ্গার, সূর্যের, আগুনের, রামের, যীশুর, কোন দেবতার, কোন পীর-পয়গাম্বরের উপাসনা বা পূজা-অর্চনা করে, তারা নির্বোধ বে-ঈমান ও কাফির। উল্লেখ্য যে, গঙ্গা, সূর্য, আগুন ইত্যাদিকে সালাম করা এবং এসবের সামনে নত হওয়াই প্রকারান্তরে এগুলোর ইবাদত করার শামিল।

ভ্রান্ত আকীদা–৩ ঃ অনেকে তিন খোদা মানে, একে 'তিন-তিনে এক' বলে, হযরত উযাইর (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে, হযরত মারয়াম (আঃ)কে খোদার স্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করে, অবতারে বিশ্বাস করে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে মনে করে, বা পরমাত্মাকে পরমেশ্বর মানে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে খোদার আংশিক জাতি নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে। এসবই শিরক ও কুফর। তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার কারণে বেঈমান, মুশরিক, কাফির সাব্যস্ত হবে। (সূরাহ্ যুমার, ৪, সূরাহ্ 'আনকাবুত, ৪৬, 'আকীদাতুত্ ত্বাহাবী, পৃ:৩০)।

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা–৪ ঃ ইয়াহুদী জাতি যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে নিজেদের দুশমন মনে করতো, তেমনিভাবে অনেক মূর্খ মুসলমানও হযরত 'আজরাঈল (আঃ)কে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখায় না। এ কারণে যে, তিনি জান কবজ করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে, ফেরেশ্তাগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আমাদের অনেক উপকার করেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের নাম

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা আমাদের জন্য জরুরী। সুতরাং হযরত আজরাঈল (আঃ)কে খারাপ ভাবা মারাত্মক ভুল। কেননা, হযরত 'আজরাঈল (আঃ) আল্লাহর হুকুমের দাস। তিনি আল্লাহর নির্দেশে মাখলূকের জান কবজ করেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় কোন মানুষের জীবন হরণ করেন না। তাছাড়া একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের পরম উপকারী। কেননা, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে পৃথক করে খোদার সান্নিধ্যে নিয়ে পৌঁছান। সুতরাং কখনো হযরত 'আজরাঈল (আঃ)কে খারাপ ভাবা উচিত হবে না। আল্লাহর নির্দেশে তিনি জান কবজ করেন। তাই তাঁকে খারাপ ভাবা বা তার সম্পর্কে মন্দ বলা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। (সূরাহ্ বাকারাহ ঃ ৯৮, সূরাহ্ নিসা ঃ ১৩৬, আকীদাতুত্ ত্বাহাবী ঃ ৮১)

আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-৫ ঃ শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, প্রচলিত কুরআন আসল কুরআন নয়; বরং এটি হচ্ছে পরিবর্তিত কুরআন; এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ) ও শি'আ সম্প্রদায়ের ইমামদের ব্যাপারে যেসব আয়াত ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সেসব আয়াত কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন। আর আসল কুরআন তাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে সতের হাজার আয়াত রয়েছে। উক্ত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি আসল কুরআন সাথে নিয়ে আসবেন।

এ আকীদা স্পষ্ট কুফরী আকীদা। যে উক্ত আকীদা পোষণ করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-"নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণকারী।" (সূরাহ্ হিজর ঃ ৯)

ভ্রান্ত আকীদা-৬ ঃ অনেকে মনে করে যে, ইঞ্জীল শরীফ (খৃষ্টানদের ভাষায় বাইবেল) সহীহ্ আসমানী কিতাব এবং তা এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও অবিকল অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করতে বা মানতে কোন অসুবিধা নেই।

এ ধরনের আকীদা কুফরী। কারণ, কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, "পূর্বের সকল আসমানী কিতাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।" (সূরাহ্ বাকারা,'৭৯)। বরং বাইবেলেই এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো বাইবেল বিকৃত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত "বাইবেল ছে কুর্আন তক" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

www.nagorikpathagar.org

ভ্রান্ত আকীদা–৭ ঃ জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, "কুরআনে কারীমের মধ্যে চারটি বুনিয়াদী পরিভাষা (দ্বীন, ইবাদত, ইলাহ্ ও রব) রয়েছে, যার অর্থ নবী (সাঃ)-এর যুগে সকলের নিকটই স্পষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দগুলো তার ব্যাপক অর্থ হারিয়ে অস্পষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এ কারণে কুরআনের আসল স্প্রিট নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কুরআনী তা'লীমের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এটাও মারাত্মক ভ্রান্ত আকীদা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে কারীমের হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই যে, কুরআনের শব্দ এবং অর্থ উভয়টার হিফাজত তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এরূপ কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, তিনি শুধু বাহ্যিক শব্দগুলোর হিফাজত করবেন, আর অর্থের হিফাজত অন্যের উপর ন্যস্ত করবেন। ফলে লোকেরা যার যার মন মত কুরআনের অর্থ করতে থাকবে বা বুঝতে থাকবে! কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমূনা পেশ করার জন্যই আখিরী নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। তিনি এ দায়িত্ব সঠিকভাবে ও যথাযথরূপে পালন করে গেছেন। তাঁর পরে সেগুলোকে সাহাবীগণ (রাঃ) হুবহু হিফাজত করেছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এরূপে তা ধারাবাহিকভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের নিকট সহীহ্ভাবে পৌঁছতে থাকবে। নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের একটি জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর কায়িম থাকবে। তাদেরকে হক থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৫৮৪)

সুতরাং উক্ত চিন্তাবিদের এ চিন্তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া এবং তিনি দেড় হাজার বছর পর উক্ত চারটি শব্দের যে স্বচিন্তাপ্রসূত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরী'আতে এ ধরনের স্বগর্হিত ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হয় যে, যদি ঐ চারটি শব্দের আসল অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দেড় হাজার বছর পর চিন্তাবিদ মহোদয় ঐ অর্থগুলো কিভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন? এখন তো আর ওহী আসার কোন পথ নেই। এ প্রশ্নের কোন প্রকার সদুত্তর চিন্তাবিদ মহোদয় ও তার অনুসারীবর্গ কখনো যে দিতে পারেননি, আর পারবেনও না কোনদিন–একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ভ্রান্ত আকীদার–৮ ঃ অনেক লোক এমন আছে, যারা হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে থাকে যে, দ্বীনের উপর চলার জন্য কুরআন শরীফই যথেষ্ট। হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীস অনেক

www.nagorikpathagar.org

ভেজালযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তার উপর নির্ভর করা যায় না।

তাদের এরূপ ধারণা-বিশ্বাসও কুফরী। এ ধরণের-আকীদা পোষণকারীরা নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ, কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিধান মুতাবিক চলার জন্য হাদীস বা নবী (সাঃ)-এর কথা ও কাজের অনুকরণ ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। (সূরাহ্ নিসা, ৮০, সূরাহ্ নাহল ঃ ৪৪, সূরাহ্ আহযাব ঃ ২১) সুতরাং হাদীস না মানলে মূলতঃ কুরআনকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এ দুই জিনিষকে মজবুতভাবে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না। সে বস্তু দু'টি হচ্ছে–আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত।" (মুআত্তা মালিক)

অন্য হাদীসে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমাদের কাউকে যেন আমি এ অবস্থায় না দেখি যে, তার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছার পর সে এরূপ মন্তব্য করে যে, আমি এসব হাদীস জানি না; আমি তো কুরআনে যা পাব, সে অনুযায়ী আমল করব।" (আবু দাউদ শরীফ)

ভ্রান্ত আকীদা–৯ ঃ অনেকে বলে থাকে যে, দ্বীনের উপর চলার জন্য সরাসরি হাদীসই যথেষ্ট এবং এ জন্য চার মাজহাবের ইমামগণের থেকে কোন ইমামের তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা ইমামের তাকলীদকে শিরক বলে মন্তব্য করে থাকে।

তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধারণ মুসলমান কেন, বিজ্ঞ আলেমের জন্যও সরাসরি হাদীস বুঝে শরীয়তের উপর চলা দুঃসাধ্য। এ জন্য সকল যমানায়ই বড় বড় মুহাক্কিক আলেমগণও মাজহাব চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে কোন এক মাজহাবের ইমামের তাকলীদ বা অনুসরন করেছেন। আর যারা কোন ইমামের তাকলীদ ব্যতীত নিজে নিজে হাদীস বুঝতে গিয়েছেন, তারা পদে পদে মুশকিলে পড়েছেন।

নিজে যা বুঝতে অসুবিধা, তা অন্য বিজ্ঞের থেকে বুঝে নেয়াই শরীয়তের নির্দেশ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–তোমরা যদি না জান, পারদর্শী আলেমগণ থেকে জেনে নাও।" (সূরাহ নাহল ঃ ৪৩/ সূরাহ আম্বিয়া ঃ৭)

উল্লেখ্য, শরীয়তের দলীল শুধু হাদীস নয়, বরং মাশায়িখগণের ঐক্যমতে, শরীয়তের দলীল মোট ৪ প্রকার ঃ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। পবিত্র কুরআন ও হাদীস সমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সঠিক আমলের পথ নির্ণয়-ই হচ্ছে কিয়াস। এটা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এর যোগ্যতা যাচাইয়ে

www.nagorikpathagar.org

ফকীহগণের মধ্যেও কর্মপরিধি জ্ঞাপক শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁরা কুরআন-হাদীস গবেষণা করে মাসলাক নির্ণয়ের মত প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগের নিকটবর্তী হওয়ায় শরীয়ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা যেভাবে কুরআন-হাদীস বুঝেছেন, উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে তাদের বুঝকেই গ্রহণ করা উম্মতের জন্য নিরাপদ ও আশংকামুক্ত।

তাই সবাই যে যার মত ক্ষুদ্র জ্ঞানে কুরআন-হাদীসের উল্টো ব্যাখা করে শরীয়তকে যাতে মনখাহী তামাশায় পর্যবসিত না করতে পারে, এ জন্য সর্বস্বীকৃত চার মাজহাবের কোন একটির অনুসরন করা ওয়াজিব বলে উলামায়ে উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইজমাকে প্রত্যাখান করে উল্টো পথে ধাবিত হওয়া কারো জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইজমায়ে উম্মতকে মান্য করা জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন। (সূরাহ্ নিসা ঃ ১১৫)

মাজহাবের গুরুত্বের কারণেই হানাফী বিজ্ঞ ফকীহগণ মাজহাব মানা ওয়াজিব বলেছেন। (ইমদাদুল মুফতীন, ১ ঃ ১৫১/জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ১ ঃ১২৭/ কিফায়াতুল মুফতী, ১ ঃ ৩২৫)

এ ছাড়াও আমরা নিজেদের দুনিয়াবী ব্যাপারেও দেখি যে, প্রত্যেকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্য বিজ্ঞজন খেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকি। দুনিয়াবী ব্যাপারে বিজ্ঞজনের তাকলীদ যেমন জরুরী ও যুক্তিগ্রাহ্য, তেমনি আখিরাতের ব্যাপারে ফিক্হ পারদর্শীগণের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বলতে কি, যারা তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি হাদীস বুঝাকে যথেষ্ট বলছেন, তারাও তো সেই হাদীসের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই কোন উস্তাদের নিকট শিখে বা শুনে থাকবেন! তাই এক্ষেত্রে সাধারণ উস্তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার চেয়ে পারদর্শী মুহাক্কিক সাহিবে মাজহাবের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্যই বটে। সেক্ষেত্রে তাকলীদকে শিরক বা নাজায়িয বলা বড়ই বিপদজনক এবং তা সাধারণ লোকদেরকে উলামায়ে কিরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক মহাষড়যন্ত্র বৈকি! এ ব্যাপারে সকলের সর্তক থাকা খুবই জরুরী।

ভ্রান্ত আকীদা-১০ ঃ ভন্ড পীরদের মুরীদেরা বলে থাকে যে, নবী (সাঃ) মি'রাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম এনেছিলেন। এর থেকে ত্রিশ হাজার উলামায়ে কিরাম জানেন; আর অবশিষ্ট ষাট হাজার ফকীর, দরবেশ ও খাজা-বাবাগণ জানেন। যা নবী (সাঃ) থেকে আলী (রাঃ), অতঃপর তার

www.nagorikpathagar.org

থেকে হাসান বসরী (রহঃ), এভাবে তা ধারাবাহিকরূপে একজনের অন্তর থেকে অন্যজনের অন্তরে প্রবেশ করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তারা এসব জ্ঞান লাভ করেছেন। সেই ষাট হাজার কালামের ব্যাপারে আলিমগণ কোন খবরই রাখেন না। এ জন্য তারা খাজা-বাবা, মাযার, ওরস ইত্যাদির বিরোধিতা করেন।

জাহিল মুরীদদের এ আকীদা কুফরী আকীদা এবং এটা নবী (সাঃ)-এর উপর নিছক মিথ্যা অপবাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন-"নবী (সাঃ) খোদা প্রদত্ত কোন হুকুম-আহকাম গোপন করেন নি।" (সূরাহ্ তাক্বীর ঃ ২৪)

তাছাড়া সেই যমানার লোকেরা উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে বলেন- "আমাকে এ ধরণের কোন কালাম দেয়া হয়নি।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৩০০)

ভ্রান্ত আকীদা-১১ ঃ জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন, দ্বীনের অর্থ হচ্ছে-ইসলামী হুকুমত, আর দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-এসবই ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স মাত্র।

এ ধরণের বহু নতুন কথা ইসলামের নামে লোকেরা সমাজে চালু করেছে। অথচ এ ধরনের নতুন কথা এবং শরী'আতের নতুন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ কুরআন-হাদীসে নেই। এ ধরনের নতুন কথা ও কাজকে শরী'আতের পরিভাষায় ইলহাদ, তাহ্রীফ (অর্থগত বিকৃতি) এবং কোন কোনটিকে 'বিদ'আত' বলে। ইলহাদ তো সুস্পষ্ট কুফ্র। আর বিদ'আতের হাকীকত হলো-দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা এবং নিজে শরী'আত প্রণেতা সাজা। এটা এতবড় অপরাধ যে, সাধারণতঃ এ জাতীয় গুনাহ্ থেকে তওবা নসীব হয় না (আল্লাহর পানাহ্)।

দ্বীনের অর্থ কোন হাদীসে বা তাফসীরে 'ইসলামী হুকুমাত' বলা হয় নি, বা আরবী কোন অভিধানেও এ অর্থ পাওয়া যায় না। তাছাড়া দ্বীনের এ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মেনে নিলে, মারাত্মক এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা লক্ষাধিক নবী-রাসূলকে(আঃ) তাঁর মনোনীত দ্বীন কায়িমের লক্ষ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্য হতে সীমিত সংখ্যক নবী-রাসূল (আঃ) ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। (তাফসীরে মাযহারী, ১ ঃ ৩৪৭, আল ইল্মু ওয়াল উলামা ঃ ২৮৬) অবশিষ্ট সকলেই ইসলামী হুকুমাত ও রাষ্ট্র পরিচালনা ছাড়াই আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করেছেন। এমতাবস্থায় দ্বীনের অর্থ যদি

www.nagorikpathagar.org

'ইসলামী হুকুমাত' ধরা হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে একথা মেনে নিতে হয় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূল (আঃ) দ্বীন কায়িমে কামিয়াব হন নি। কত মারাত্মক কথা!

তাছাড়া একথাও সঠিক নয় যে, দ্বীনের মধ্যে আসল হলো জিহাদ। আর নামায, রোযা ইত্যাদি হচ্ছে সেই জিহাদের ট্রেনিং কোর্স। কুরআন, সুন্নাহ ও সকল হাক্বানী উলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত হলো–নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত–এগুলো দ্বীনের বুনিয়াদী ও মৌলিক ইবাদত। আর আল্লাহর যমিনে দ্বীন কায়িম করার প্রচেষ্টার নাম হলো জিহাদ। যেমন, হাক্বানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগে সহীহভাবে যেসব মেহনত চলছে, সেসবই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং জিহাদ মূল লক্ষ্যবস্তু নয়; বরং তা হচ্ছে মূল লক্ষ্যবস্তু অর্জনের প্রচেষ্টা ও মাধ্যম। তেমনিভাবে ইসলামী হুকুমাতও দ্বীনের মূল লক্ষ্যবস্তু নয়, তবে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন কায়িম করার উপায় ও উপলক্ষ হিসেবে ইসলামী হুকুমাত কায়িম বা তার প্রচেষ্টা চালানো জরুরী। (কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ৯৯)

মোদ্দা কথা, দ্বীনের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী। (সূরাহ্ যারিয়াত- ৫৬, বুখারী শরীফ, ১ ঃ ৬) আর আল্লাহর বন্দেগী তথা সহীহ ঈমান ও 'আমলে সালিহা (যার মধ্যে ইসলামী হুকুমাত কায়িমের জন্য প্রচেষ্টা শরী'আত সমর্থিত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাওয়াও শামিল) -এর নগদ পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ইসলামী হুকুমাত দান করেন। (সূরাহ্ নূর, ৫৫) যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা যদি ইসলামী হুকুমত দান করেন, তাহলে মুসলমানগণ সেই ইসলামী হুকুমাতের মাধ্যমে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কায়িম করবে। সম্পূর্ণ হুকুমাতকে তারা দ্বীন কায়িমের এবং জনগণের খিদমতের জন্য কাজে লাগাবে।" (সূরাহ্ হজ্জ, ৪১) আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইসলামী হুকুমাত দান না-ও করেন, তবুও মুসলমানদের সাধ্যানুযায়ী দ্বীনের কাজ করে যেতে হবে। ইসলামী হুকুমাতের আশায় দ্বীনের কাজ না করে বসে থাকার কোন অনুমতি নাই।

এখন আসুন, চিন্তাবিদ মহোদয়ের কথা অনুযায়ী যদি নামায-রোযাকে জিহাদের ট্রেনিং কোর্স হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন হয়–ট্রেনিং কোর্স কি সারা জীবন এক ধরনের থাকে, না ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়? দ্বিতীয়তঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে ট্রেনিং কোর্স ধরা হলে, জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমাত কায়িম হওয়ার পর ট্রেনিং কোর্সের আর প্রয়োজন কি? তৃতীয়তঃ যাদের উপর কখনো জিহাদ ফরজ হয় না, যেমন, অন্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর

www.nagorikpathagar.org

মা'যুর, তাদের উপর নামায, রোযা ফরজ হওয়ার অর্থ কি? সুতরাং উক্ত ধারণা কোনভাবেই সহীহ্ হতে পারে না। বরং তা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন হওয়ার কারণে সুস্পষ্ট গোমরাহী। এরূপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ভ্রান্ত আকীদা–১২ ঃ জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, কুরআনের তাফসীর করার জন্য একজন অধ্যাপকই যথেষ্ট; এ জন্য আলিম হওয়া জরুরী নয়। তার এ দর্শনের ভিত্তিতে বর্তমানে অনেক জেনারেল শিক্ষিত লোকদেরকে (যারা কুরআনের সহীহ্ তিলাওয়াতও জানে না) তাফসীর করতে দেখা যায়। সেই চিন্তাবিদ সাহেব স্বীয় তাফসীরের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমি তাফসীর লিখতে গিয়ে তাফসীরের পুরাতন ভান্ডার থেকে কোন সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা করিনি। বরং এক একটি আয়াত তিলাওয়াত করার পর উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার মন-মস্তিষ্কে যে প্রভাব পড়েছে, আমি হুবহু তা তাফসীর হিসেবে লিখে দিয়েছি।"

উল্লেখিত কথাগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকর ও ঈমান বিধ্বংসী। এ ধরনের তাফসীরকে বলা হয় 'তাফসীর বির-রায়' বা মনগড়া তাফসীর, যা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা, লেখা, শ্রবণ করা ও সে তাফসীর পড়া–সবই হারাম। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি নিজের রায় মুতাবিক তাফসীর করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামের মধ্যে নির্ধারণ করে নেয়।"

(তিরমিযী শরীফ ও মিশকাত শরীফ ঃ ৩৫)

সকল হাক্কানী উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের তাফসীর করার জন্য ১৫ টি বিষয়ের উপর দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করা জরুরী। (মিরকাত ১ ঃ ২৯২ ও ইত্‌কান ঃ ১৮১) যাতে করে আরবী ভাষার উপর এবং নবী (সাঃ) থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যে তাফসীর ধারা বর্ণনা করেছেন, তা সামনে রেখে তাফসীর করা যেতে পারে। উক্ত ১৫টি বিষয়ের ব্যাপারে যার দক্ষতা ও পারদর্শিতা নেই, শরী'আতের দৃষ্টিতে তার জন্য তাফসীর লেখা বা তাফসীর করার অনুমতিও নেই। এরূপ ব্যক্তির তাফসীরকে 'তাফসীর বির রায়' বা মনগড়া তাফসীর বলা হয়। আর ঐ ধরনের তাফসীর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে কেবলমাত্র গোমরাহী ছড়ায় এবং এর দ্বারা ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এটা নিঃসন্দেহে ঈমান বিধ্বংসী কাজ, যা ক্ষেত্র বিশেষে কুফ্‌রী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। চিন্তাবিদ মহোদয়ের অধ্যাপকগণ ১৫টি বিষয়ের উপর পারদর্শী হওয়া তো দূরের কথা, এ সবগুলোর

www.nagorikpathagar.org

নামও জানেন না, অথচ তাঁরা তাফসীর করছেন!

<u>ভ্রান্ত আকীদা-১৩ ঃ</u> অধুনা নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, নামায-রোযা আদায় করা, পর্দা রক্ষা করা ইত্যাদি ফরজ কাজ সমূহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে এবং সূদ, ঘুষ, মাতা-পিতার নাফরমানী, গান-বাদ্য, সিনেমা, টিভি ইত্যাদি গুনাহের কাজকে হারাম মনে করে না। বরং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করে।

তাদের জন্য এসব হারাম কাজ সমূহকে বৈধ মনে করা কুফরী। এর দ্বারা তারা ঈমান ও ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বাহ্যিকভাবে যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করছে, তাও কোন কাজে আসবে না। আদমশুমারীতে তাদেরকে মুসলমান শুমার করলেও আল্লাহর দরবারে তারা মুসলমানরূপে গণ্য হবে না।

জেনে রাখুন, সারা জীবন যদি কেউ ফরজ পালন না করে এবং গুনাহ্ করতে থাকে, কিন্তু কোন ফরজকে অস্বীকার না করে বা কোন গুনাহকে হালাল মনে না করে, তাহলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হবে না; বরং সে মুমিনই থাকবে। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের কারণে ফাসিক ও গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে কোন একটি ফরজকে অস্বীকার করলে, কিংবা হারামকে হালাল মনে করলে, তা কুফরী কাজ হবে এবং তাতে সে ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

<u>ভ্রান্ত আকীদা-১৪ ঃ</u> কাদিয়ানী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবী করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নন। বরং তারপরেও আরো নবী আসতে পারেন। এর কিছু দিন পর সে নিজেই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। আর অনেক মূর্খ লোক তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করা বা এরূপ দাবী সমর্থন করা প্রকাশ্য কুফর। নবুওয়াত দাবী করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজে কাফির হয়েছে এবং এ দাবী মেনে নেয়ার কারণে তার অনুসারীরাও কাফির হয়েছে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। মুফ্তী আযম শফী (রাহঃ) তৎপ্রনীত 'খতমে নবুওয়াত' নামক কিতাবে প্রায় একশ'টি আয়াতে কুরআনী পেশ করেছেন (সূরাহ আহযাব ঃ ৪০, সূরাহ বাকারাহ ঃ ৪ ইত্যাদি) এবং দু'শরও বেশী সহীহ হাদীস পেশ করেছেন (বুখারী শরীফ ঃ ৫০১

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি)–যেগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবীই শেষ নবী এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের ও ওহীর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এজন্য নবী (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর যখন 'মুসাইলামাতুল কায্যাব' নবুওয়াত দাবী করে, তখন এই মর্মে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের নবীই শেষ নবী। তাঁর পরে কোনক্রমেই আর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটতে পারে না। সুতরাং যে কেউ এখন নবুওয়াতের দাবী করবে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাকে কতল করে দেয়া জরুরী। উল্লেখিত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ঐক্যমতের ভিত্তিতে মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কতল করে উম্মতের ঈমান হিফাজতের ব্যবস্থা করেন।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত দাবী প্রমাণের জন্য যেখানে কুরআনের একটা আয়াতই যথেষ্ট ছিল, সেখানে প্রায় একশ' আয়াত এবং দু'শ'র অধিক হাদীস প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের নবীর পরে যে কেউ নবুওয়াতের দাবী করবে, সে কাফির এবং তাকে যে ব্যক্তি নবী হিসেবে স্বীকার করবে, সেও কাফির। এমন কি মিথ্যুক নবীর নিকট তার নবুওয়াতের দলীল জানতে চাওয়াও কুফরী কাজ। কারণ, দলীল-প্রমাণ চাওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে,এখনো নতুন নবী আগমনের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তোমার দলীল সঠিক হলে, তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করা যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

সুতরাং মুসলমানগণ এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। আহমাদিয়া বা কাদিয়ানীরা সম্প্রদায় এখন বাংলাদেশের বড় ও প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে তাদের অফিস খুলে আস্তানা গেড়েছে। সেখানে তারা বড় বড় অক্ষরে কালিমায়ে তাইয়্যিবা লিখে রেখেছে। তাদের নাম মুসলমানদের নামের মত। তারা মুসলমানদের মত কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মর্জি মত কুরআনের ব্যাখ্যা করে। তারা বই-পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করে এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখায়। খবরদার! কখনো তাদের ফাঁদে পা দিবেন না। তারা এমনও বলে যে, তোমাদের মাঝে তো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ইত্যাদি মাযহাব আছে। আহমাদিয়া জামা'আতও সেই ধরনের একটা মাযহাব। এটা নির্জলা মিথ্যাচার। চার মাযহাবের মধ্যে মূল আকীদার ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই। হ্যাঁ, এ

www.nagorikpathagar.org

ধরনের মতভেদ রয়েছে যে, নামাযের মধ্যে আমীন আস্তে না জোরে পড়তে হবে, হাত বুকে না নাভীর নীচে বাঁধতে হবে, ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পড়তে হবে কি না? ঈদে ছয় তাকবীর না বার তাকবীর ইত্যাদি। এধরনের ছোট-খাট কয়েকটি মাসআলা নিয়ে কেবল তাদের মধ্যে মতভেদ, আর এসবই আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে; ঈমান-আকীদার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। ঈমান-আকীদার ব্যাপারে সকল মাযহাবই এক। সুতরাং সাবধান! আহমদিয়া জামা'আত কখনো হানাফী, শাফেয়ী মাযহাবের মত নয়। বরং তারা ভ্রষ্ট ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মত কাট্টা কাফির ও বে-ঈমান।

তারা বলে থাকে যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)কে খাতামুন নাবিয়্যীনরূপে বিশ্বাস করি; বরং আমাদের আকীদার সাথে দ্বি-মত পোষণকারীদের চেয়ে একশত গুণ বেশী বিশ্বাস করি। কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের সহীহ্ অর্থ হচ্ছে–তিনি নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানী। উক্ত শব্দের অর্থ–শেষ নবী নয়। কারণ, এ অর্থ গ্রহণ করার দ্বারা মূলতঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করা হয়।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের এরূপ উক্তিও একটি মারাত্মক ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, বহু হাদীসে নবী (সাঃ) নিজেকে খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে উল্লেখ করার সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, "আমার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না।" এরূপ ব্যাখ্যা তিনি এ জন্যই দিয়েছিলেন, যাতে করে কাদিয়ানীদের মত গোমরাহ দলসমূহ খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার কোন সুযোগই না পায়। নবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রমাণের জন্য নতুন নবীর আগমনের দাবীও ভিত্তিহীন। বরং নতুন নবী না আসলে তাঁর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আরো বেশী প্রকাশ পায়।

অনেক নব্য শিক্ষিত লোক এমন রয়েছে, যাদের দ্বীনী জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। ফলে তারা কাদিয়ানী ও আহমদীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করাটাকে উলামায়ে কিরামের সংকীর্ণতা বলে মনে করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। আহমদী জামা'আত বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের মতভেদ রয়েছে ঈমান ও আকীদা ব্যাপারে। কারণ, কাদিয়ানী মতবিরোধিতাকে কখনো হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীদের পারস্পরিক (ফিক্বহী মাসায়িল সম্পর্কিত) মতবিরোধিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না। কারণ, কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে কাফির। এদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এরা সরলপ্রাণ

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। মুসলমানদের ঈমানের হিফাজত উলামায়ে কিরামের বিশেষ দায়িত্ব। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং পরকালের জওয়াবদিহীতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জিম্মাদারী আদায় করছেন। সুতরাং তাদের এ জিম্মাদারী আদায়কে কিভাবে সংকীর্ণতা বলা যেতে পারে? বস্তুতঃ কাদিয়ানী ভ্রান্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে সতর্ক করা আলেমগণের দ্বীনী দায়িত্ব।

ভ্রান্ত আকীদা–১৫ ঃ অনেক শি'আ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, তাদের ইমামগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তারা গায়িব জানেন এবং তারা কুরআনের যে কোন হালাল বস্তুকে যখন-তখন হারাম ঘোষণা করতে পারেন। অনুরূপভাবে যখন ইচ্ছা যে কোন হারাম বস্তুকে হালাল ঘোষণা করার অধিকার রাখেন। তারা আল্লাহ্‌র এত বেশী প্রিয় যে, কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশ্‌তা পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী স্থানেও পৌঁছতে পারেন না।

শি'আদের এ সকল আকীদাও শরী'আত বিরোধী ও কুফরী (সূরাহ্ আনআম ঃ ৫৯, সূরাহ্ ইউনুস ঃ ১৫, মিশকাত ঃ ২০৪) এটা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ নবী হওয়ার আকীদার পরিপন্থী হওয়ায় তা স্পষ্ট কুফরী। কারণ, তাদের ইমামদের জন্য যে অবাস্তব গুণাবলীর দাবী করা হয়েছে, তাতে তাদের ইমামগণকে নবী-রাসূলের (আঃ) চেয়েও উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এ বলে যে, নবীগণও এ সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। আখিরী নবী (সাঃ)-এর পরে যদি নবীদের চেয়ে ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হতে পারে, তাহলে নতুন নবী আসতে বাধা কোথায়? আসল কথা হলো–নবুওয়াতের দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন বাতিল পন্থীদের মাথা গরম হয়ে গেছে। আর নবুওয়াতের সেই বন্ধ দরজা খোলার জন্য মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জিল্লী নবী বা ছায়া নবীর নামে, আর শি'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমামতের নামে তা পুনরায় খুলতে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। মুসলমানদের এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

ভ্রান্ত আকীদা–১৬ ঃ শি'আদের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, নবী (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ) ব্যতীত সকল সাহাবায়ে কিরাম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাদের এ আকীদা কুরআনে কারীমের 'সূরাহ্ তওবা'র ১০০ নং আয়াত "মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রবর্তী-প্রবীণ এবং যারা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি

www.nagorikpathagar.org

সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ পাক তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবনসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই বড় সফলতা" এবং সূরাহ্ ফাতহর ২৯ নং আয়াত "মুাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সিজদায় দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন" ইত্যাদি বিভিন্ন আয়াত ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এটা কুফরী আকীদা।

যে সকল লোক নবী (সাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নবী (সাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদেরকে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীসে সমগ্র মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি খুলাফায়ে রাশিদীন-এর খিলাফতের সত্যতা ও হাক্কানিয়াত সম্পর্কে স্বয়ং নবী (সাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে বিরূপ বিশ্বাস সুস্পষ্ট কুফরী। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

<u>ভ্রান্ত আকীদা-১৭ ঃ</u> **শি'আদের এক ধর্মীয় নেতা লিখেছেন ঃ "হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) শুধুমাত্র নেতৃত্ব ও দুনিয়ার লোভে বহু বৎসর যাবত নবী (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অন্যথায় ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের নেতৃত্বের লোভের বর্ণনা দিতে গিয়ে উক্ত শি'আ নেতা আরো লিখেছেন যে, "ক্ষমতা দখলের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে কোন দল সৃষ্টি করতে হলেও তারা পিছপা হতো না। এমনকি যদি কুরআনের কোন আয়াতে মহান আল্লাহ্ নবী (সাঃ)-এর পরে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের কথা ঘোষণা করতেন, তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস তৈরী করে নবী (সাঃ)-এর বরাত দিয়ে আলী (রাঃ)-এর খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত রহিত হওয়ার কথা ঘোষণা করতেন।"** (নাউজু বিল্লাহ্)

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফরী আকীদা। নবী কারীম (সাঃ) তাঁদের উভয়ের ফজীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। (মিশকাত ঃ ২ ঃ ৫৬০) এমনকি মি'রাজে তিনি হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর জান্নাত পরিদর্শন করেছেন। (বুখারী শরীফ, ১ ঃ ৫২০) তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, "এসব বিষয়ের উপর আমি

www.nagorikpathagar.org

ঈমান রাখি এবং আবু বকর ও উমরও ঈমান রাখে। অথচ সেই মজলিসে তাদের দু'জনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না।" (বুখারী শরীফ. ১ ঃ ৫১৭)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁদের প্রতি নবী (সাঃ) কতটুকু আস্থা রাখতেন। তারপরও যদি বলা হয় যে, ইসলাম ও কুরআনের সাথে তাঁদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাহলে এটা যে কতবড় ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার–তা অতি সহজেই অনুমেয়।

ভ্রান্ত আকীদা–১৮ ঃ **জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন, নবীগণের জন্য মা'সূম বা নিষ্পাপ হওয়াটা জরুরী নয়; বরং তাঁদের নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে গুনাহ্ থেকে হিফাজত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হিফাজত তুলে নিলে, তাদের থেকেও সাধারণ মানুষের মত গুনাহের কাজ হতে পারে। আর বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে সাময়িকভাবে হিফাজত ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটি গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে না করে। সেই চিন্তাবিদ এতদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে কোন্ নবী থেকে কি কি গুনাহ্ প্রকাশ পেয়েছে, তারও একটা ফিরিস্তি পেশ করেছেন।**

উল্লেখিত আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এটা কুফরী আকীদা। কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে নবী-রাসূলগণের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(সূরাহ্ আল ইমরান ঃ ৩১,ও সূরাহ্ আহযাব ঃ ২১)

এসব আয়াতের দাবী অনুযায়ী, সকল নবী ও রাসূল (আঃ) মা'সূম ও নিষ্পাপ এবং তাদের থেকে কোনরূপ গুনাহ্ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এটাই সহীহ আকীদা। প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন! যদি প্রত্যেক নবী-রাসূল (আঃ) থেকে মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিফাজত ব্যবস্থা উঠিয়ে নেন, তাহলে সেটা উম্মতগণ কিভাবে বুঝতে পারবে? তারা তো আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী নবী-রাসূলের (আঃ) সব কথা ও কাজ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করবে। সুতরাং চিন্তাবিদ সাহেবের কথা মানলে নবী-রাসূলগণের (আঃ) সমগ্র জীবনের তা'লীম-তরবিয়্যত সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাঁদের প্রত্যেক কথা ও কাজের ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নবী (আঃ)-এর এ কথা বা কাজের সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হিফাজত ব্যবস্থা জারী রেখেছিলেন, না রাখেন নি? যদি জারী না রেখে থাকেন, তাহলে তাঁর এ কথাতো সহীহ নাও হতে পারে। (নাউজুবিল্লাহ) কিরূপ জঘন্য কথা! নবী-রাসূলগণের (আঃ)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে উম্মত যদি এ ধরনের সন্দেহের সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের দ্বীন ও ঈমান কিভাবে কায়িম থাকবে? আরো লক্ষ্য করুন, তার কথা-"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবী-রাসূল (আঃ) থেকে হিফাজত ব্যবস্থা উঠিয়ে নিয়ে দু'একটি গুনাহের সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, তারা খোদা নন"-এ কথার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হয়, নবী-রাসূলগণ (আঃ) খোদা নন-এ কথা বিশ্বাস করা জরুরী। তবে তা বুঝানোর জন্য তাদেরকে পাপী সাব্যস্ত করার কি কোন প্রয়োজন আছে? নবী-রাসূলগণের (আঃ) পানাহারের প্রয়োজন হয়, রোগ-শোক হয়, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসারের প্রয়োজন হয়, হাট-বাজার, আরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে, এ ধরনের আরো শত শত মানবীয় গুণাবলী কি একথা বুঝাতে সক্ষম নয় যে, তারা মানুষ ছিলেন, খোদা ছিলেন না? বা অন্য কোন মখলুক ছিলেন না? নবীগণের শানে উল্লেখিত ধরনের অপবাদ নিঃসন্দেহে কুফরী।

ভ্রান্ত আকীদা-১৯ ঃ জনৈক চিন্তাবিদ খিলাফত ধ্বংসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের জন্য হযরত উসমান (রাঃ)কে প্রথম আসামী বানিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আসামী হচ্ছেন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)। (নাউজুবিল্লাহ)

তার বর্ণিত এসব তথ্য সম্পূর্ণরূপে শি'আ ও ইয়াহুদীদের দ্বারা লিখিত ইসলামের নামে বিকৃত ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। ইসলামের কোন সহীহ ইতিহাস দ্বারা এসব বানোয়াট তথ্য প্রমাণিত নয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে ইসলামের নামে যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তারও অবস্থা একই রকম। ইসলামের নামে এসব ইতিহাস শি'আ ও ইয়াহুদী কর্তৃক প্রথমতঃ আরবী ভাষায় লেখা হয়, তারপর আরবী হতে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। এরপর আমাদের দেশের পন্ডিতগণ উক্ত ইংরেজী গ্রন্থসমুহ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এসব ইতিহাস পড়ে ইসলামের সঠিক ঘটনা জানার কোন উপায় নেই। বরং এগুলো পড়ে অনেকেই বিভ্রান্তি বশতঃ সাহাবা বিদ্বেষী হয়ে ঈমান হারাচ্ছে, আবার কেউবা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। তারা হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে এরূপ কুধারণা পোষণ করে যে, তিনি স্বজনপ্রীতি করে নিজের লোকদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। তেমনিভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রাজতন্ত্রের বুনিয়াদ কায়িম করেছেন ইত্যাদি। (নাউজুবিল্লাহ)

তাদের এসব ধারণা একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। সহীহ ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ যেমন, 'আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া', 'আত্ তারীখুল কামিল' ইত্যাদি যারা

www.nagorikpathagar.org

পড়েছেন, তাদের নিকট আমাদের দাবীর সত্যতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই খবরদার! ইসলামের নামে গলদ ইতিহাস পড়ে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে ঈমান হারাবেন না। সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখা কুফর ও নিফাক এবং একজন মুমিন-মুসলমানের ঈমানের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

ভ্রান্ত আকীদা-২০ ঃ কতেক মূর্খ লোক বলে থাকে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর তুলনায় আমাদের নবী বেশী দয়াশীল ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) বেশী রাগী ছিলেন, আর আমাদের নবী অত্যন্ত নরম মেযাজের ছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) রাজনীতি জানতেন না, আমাদের নবী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইত্যাদি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেক বক্তাও ওয়াজের মধ্যে এরূপ বলে ফেলেন। অথচ এর থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। কুরআন ও হাদীসে এর থেকে পরহেয করতে জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুই নবীর (আঃ) মধ্যে তুলনা করে একজনকে ছোট করে দেখানো বা একজনকে কোন ব্যাপারে অসম্পূর্ণ বা নাকিস গণ্য করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। পয়গাম্বরগণ সকলেই সব দিক দিয়ে কামিল ও সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। (সূরাহ্ বাকারা ঃ ২৮৫ ও বুখারী শরীফ ১ঃ৪৮৪) অবশ্য কামিল হওয়ার ব্যাপারে কারো মর্তবা বেশী, আর কারো কর্তবা ছিল কম।

তাই সকল নবী সম্পর্কে সুধারণা রাখতে হবে এবং তাঁদের সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। একজনের তুলনায় অন্যজনকে ছোট, হেয় বা নাকিস গণ্য করা যাবে না।

ভ্রান্ত আকীদা-২১ ঃ নব্য শিক্ষিতদের অনেকে নবী-রাসূলগণের (আঃ) মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ধরা না পড়ায় অস্বীকার করে বসে।

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বণর্না দ্বারা নবী-রাসূলগণের (আঃ) মু'জিযা সুপ্রমাণিত। সুতরাং বিনা বাক্য ব্যয়ে এগুলো মেনে নেয়া এবং এগুলো বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য জরুরী। কেউ এগুলো অবিশ্বাস করলে, তার ঈমান থাকবে না। যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য নমরূদের আগুন আল্লাহর আদেশে শান্তিদায়ক ঠান্ডায় পরিণত হয়েছিল। (সূরাহ আম্বিয়া ঃ ৬৯) হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর কওমের জন্য লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে দেয়া হয়েছিল। (সূরাহ আলে ইমরান ঃ ৪৯) হযরত ঈসা (আঃ) قُمْ بِاذْنِ اللّٰهِ বললে মুর্দা জীবিত হয়ে যেত। (সূরাহ ত্বাহা ঃ ৭৭) আমাদের নবী (সাঃ)-এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ

www.nagorikpathagar.org

দ্বিখন্ডিত হয়েছিল ইত্যাদি। (সূরাহ্ কামার ঃ ১)

বস্তুতঃ কোন বিষয় যুক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়ার পর তা মানার নাম ঈমান নয়। বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কথাকে সরল অন্তঃকরণে বিনা যুক্তি-তর্কে মানার নামই হচ্ছে ঈমান। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নাশর, মীযান-পুলসিরাত ইত্যাদি, কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো সাইন্স আর যুক্তি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে এগুলো কখনো সে বুঝতে পারবে না। কারণ, যুক্তি ও সাইন্স পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। আর আখিরাত ও পরকালের বস্তুসমূহ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি সীমার বাইরের জিনিষ। সুতরাং যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝতে চাইলে, তার জন্য ঈমান আনা দুষ্কর। এ জন্য 'সূরাহ্ বাকারার' শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রথম গুণ হচ্ছে–অদৃশ্য বস্তুসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা"। (সূরাহ্ বাকারা ঃ ৩)

মূলতঃ শরী'আতের বিধানসমূহ হচ্ছে বাদশাহ্, আর যুক্তি-বিজ্ঞান হচ্ছে তার দাসী তুল্য। বাদশাহের নির্দেশ পাওয়ার পর তা পালন করার জন্য তার বাঁদীর নিকট জিজ্ঞাসা করা যেমন বেওকূফী, তেমনিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কোন নির্দেশ দেয়ার পর তা গ্রহণ করার জন্য যুক্তি বা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করাও চরম মূর্খতা ও জাহিলিয়্যাত। স্মার্তব্য যে, হযরত আদম(আঃ)কে সিজদা না করে যুক্তির পথে সর্বপ্রথম পা বাড়িয়েছিল ইবলিস। এরই পরিণতিতে সে আল্লাহর দরবার থেকে বহিস্কৃত হয়ে চির জীবনের জন্য আল্লাহর দুশমন আখ্যায়িত হয়েছে।

ভ্রান্ত আকীদা–২২ ঃ কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাত্রের মধ্যে যে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুক্বাদ্দাস, অতঃপর সেখান থেকে সাত আসমান ও আরশ ভ্রমণ করেছেন, তারপর ফজরের পূর্বে আবার মক্কা শরীফ ফিরে এসেছেন–এঘটনাকে তারা বিশ্বাস করে না। পশ্চিমা ও ইউরোপ ওয়ালাদের যুক্তি ও সায়েন্সের প্রভাবে তারা মি'রাজকে কাল্পনিক কাহিনী বলে আখ্যায়িত করে।

তাদের এ আকীদা যেহেতু সরাসরি কুরআনে কারীমের সূরাহ্ বনী ইসরাঈল ১ নং আয়াত "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাহকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন–যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা"-এর পরিপন্থী, সুতরাং তা স্পষ্ট কুফর। মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও সময়ের স্বল্পতা ইত্যাদি যত প্রশ্নই করা হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরতের সামনে তা নিতান্তই খোড়া ও অবাস্তব। যে খোদা আসমান, যমীন, সময়, মধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ এতবড় সৌরজগত একটা كُنْ শব্দের দ্বারা সৃষ্টি করলেন, সেই খোদার জন্য স্বীয় হাবীবকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সপ্ত আসমান ও আরশের সফর করানো কোন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীদের তৈরী বিভিন্ন খেয়াযান যদি মধ্যার্কষণ শক্তিকে ভেদ করে তার উপরে যেতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার তৈরী যান 'বুরাক-রফরফ' সেটাকে ভেদ করতে পারবে না কেন? এ সম্পর্কে অবান্তর প্রশ্ন তোলা আহমকীরই পরিচায়ক।

<u>ভ্রান্ত আকীদা-২৩</u> ঃ নব্য শিক্ষিতদের অনেকে ডারউইনের মতবাদ "বানর থেকে পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে"-একথা বিশ্বাস করে। অনেকে কতেক বিজ্ঞানীদের অভিমত হিসেবে বিশ্বাস করে যে, সূর্য তার স্থানেই স্থির অবস্থান করছে, সূর্য ঘুরছে না। আবার অনেকে সূদভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি বা আল্লাহর নাফরমানীর কথা মেনে নিতে চায় না। কেউবা জন্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুখ-শান্তি রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। অনেকে ইংরেজদের তৈরী পাঠ্যসূচীতে শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে অনেক ধরণের পশ্চিমা দর্শন ও ফিলোসফিকে (যা সম্পূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী) মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের ইসলামের বন্ধন অতি দুর্বল ও ক্ষীণ হওয়ায় তারা এগুলোকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

তাদের এসব বিশ্বাস সর্বস্বই মারাত্মক ভুল। এসব ভুলের দরুণ তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অনেক আয়াত ও হাদীসকে অস্বীকার করে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে নষ্ট করে ফেলছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদেরে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ১) এ ছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে মানব জাতিকে يَابَنِىْ اٰدَمَ "হে আদম-এর সন্তান" বলে সম্বোধন করা হয়েছে ।

পাঠক! চিন্তা করুন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আমি একজোড়া নর-নারী থেকে সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং সেই নর হচ্ছেন হযরত

www.nagorikpathagar.org

আদম (আঃ) ও নারী হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আঃ)। আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হচ্ছে নবীর আওলাদ। এখন কোন অমুসলিম যদি বানর থেকে মানুষ তৈরীর দাবী করে, তাহলে আমাদের বলার কী আছে? আমরা (মুসলমানগণ) এতটুকুই বলব যে, বংশ তালিকা বা বংশ পরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আজ হয়ত কেউ তার বংশ পরাম্পরা বানর থেকে বর্ণনা করছে, আগামীকাল কেউ তার বংশ পরম্পরা শুকর থেকে বর্ণনা করবে। আমরা মুসলমান জাতি। আমাদেরও বংশ পরম্পরা বর্ণনা করার অধিকার আছে। সেই হিসেবে আমরা বলবো যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানের বদৌলতে আমাদেরকে হিফাজত করেছেন। তিনি আমাদেরকে কোন জানোয়ারের আওলাদ না বানিয়ে তাঁর প্রিয় নবী হযরত আদম (আঃ)-এর আওলাদ বানিয়েছেন।

সার কথা, যারা ডারউইনের মতবাদ বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের এ সমস্ত আয়াত বিশ্বাস করে না। তেমনিভাবে যারা বিজ্ঞানীদের এ দর্শন 'সূর্য ঘুরে না, বরং নিজের স্থানে স্থির রয়েছে' বিশ্বাস করে, তারা সূরাহ্ ইয়াসীন-এর ৩৮ নং আয়াত وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا "সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে" বিশ্বাস করে না। যারা সূদভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে উন্নতির বিশ্বাস রাখে, তারা 'সূরাহ্ বাক্বারার ২৭৬ নং আয়াত يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰى وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ "আল্লাহ তা'আলা সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন" বিশ্বাস করে না। অথচ স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআনের কোন একটি আয়াত অবিশ্বাস করলে, ঈমান চলে যায়। এখানে শুধু নমুনা হিসেবে ২/৪টা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে এ ধরণের অনেক বিষয় আছে, যা সরাসরি কুরআনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। সুতরাং সংশ্লিষ্ট লোকদের কর্তব্য হচ্ছে–এসব পশ্চিমা দর্শন বিশ্বাস না করা এবং এতে প্রভাবান্বিত না হয়ে হক্বানী উলামায়ে কিরাম থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে এতদ্সম্পর্কিত বিধান জেনে ঐসকল ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে কলিজার টুকরা সন্তানদের দ্বীন-ঈমানের হিফাজত করা। দ্বীনদার শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন।

ভ্রান্ত আকীদা–২৪ ঃ নব্য শিক্ষিতদের অনেকে বিশ্বাস করে যে, পরকালের মুক্তি কেবলমাত্র ইসলামের উপরই নির্ভরশীল নয়; বরং যে কোন ধর্ম অবলম্বন করে সেই ধর্মমতে চললে, সে ব্যক্তি পরকালে নাজাত পাবে। চাই সে খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী হোক, বা ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারী হোক, কিংবা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হোক অথবা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হোক।

www.nagorikpathagar.org

আবার অনেকে বলে, মানব সেবাই আসল ধর্ম; অন্য কোন ধর্ম জরুরী নয়।

এসবই পবিত্র কুরআনের ঘোষণার পরিপন্থী ও গর্হিত আকীদা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্র দরবারে মনোনীত দ্বীন একমাত্র " ইসলাম"। (সূরাহ্ আলে ইমরান ঃ ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যাতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, আল্লাহ্র দরবারে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সূরাহ্ আলে ইমরান ঃ ৮৫)

সুতরাং উল্লেখিত আকীদা কুরআনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা কুফরী আকীদা। এ আকীদা নিয়ে যদি কেউ সারা জীবন প্রথম কাতারে নামায পড়ে এবং কোটি কোটি টাকা দান-খয়রাত করে, মানব সেবা করে, বা বহু বার হজ্জ-উমরা আদায় করে, তারপরও সবই নিষ্ফল-বেকার গণ্য হবে। ঈমান না থাকার দরুণ এসব আমলের কোন বিনিময় সে আল্লাহ্র দরবারে পাবে না।

<u>ভ্রান্ত আকীদা-২৫ ঃ</u> **অধুনা অনেক লোক টুপী, দাড়ী, মিসওয়াক, আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এগুলোকে খুবই হেয় নজরে দেখে এবং এগুলোকে অনর্থক ও বেকার বলে মনে করে। তাঁরা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতেও কার্পণ্য করে না।**

তাদের এ ভূমিকা খুবই মারাত্মক। এসবই মুরতাদদের কাজ। শরী'আতের কোন বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়-যদিও তা সামান্য কোন আমলই হোক না কেন। যেমন ধরুন, টুপী পরা সুন্নাত; ফরজ নয়। কিন্তু কেউ যদি এ সুন্নাত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাহলে ঈমানহারা হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। অতএব, এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান থাকতে হবে। (শরহে আকায়িদ ঃ ১৬৭)

<u>ভ্রান্ত আকীদা-২৬ ঃ</u> **অনেক নব্য শিক্ষিত মুসলমান এমন রয়েছে, যারা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে প্রচার করে থাকে যে, মুসলমানদের মুক্তির এখন একমাত্র পথ গণতন্ত্র, অথবা সমাজতন্ত্র, কিংবা অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র। বিজ্ঞান ও সাইন্সের চরম উৎকর্ষের এ যুগে ইসলামের মত সেকেলে মতবাদ দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। তারা আরো বলে থাকে, আলিম সমাজই প্রগতির চাকাকে পিছনের দিকে টেনে রেখেছে। তারাই প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।**

তাদের এ আকীদা ও বিশ্বাস স্পষ্ট কুফরী আকীদা। (সূরাহ আন'আম ঃ ১১৬) কারণ, নবী (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কামিয়াবী ও উন্নতির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ইসলাম। এটাই নবী (সাঃ)-এর তরীকা।

www.nagorikpathagar.org

সেটাকে সেকেলে বলে প্রত্যাখ্যান করা, উলামায়ে কিরামকে হেয় মনে করা এবং গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের মত কুফরী মতবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতঃ তা কায়িমের লক্ষ্যে প্রচার-প্রসার করা স্পষ্ট কুফরী কাজ। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে, উপরোক্ত মতবাদসমূহ জনগণ শোষণের হাতিয়ার। তারা হালাল-হারামের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে সূদ-ঘুষ ও নানা প্রকার অবৈধ পন্থায় যে উন্নতি করছে, এটাকে প্রকৃতপক্ষে কোন উন্নতি বলা যায় না। এসব মতবাদ গ্রহণ করা আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর।

আধুনিক যুগের শিক্ষিতরা সভ্যতা, ভদ্রতা ও উন্নতি-প্রগতি বলতে লন্ডন-আমেরিকা, চীন-জাপানের তথাকথিত সভ্যতা ও উন্নতিকে বুঝিয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) দৃষ্টিতে, বেদ্বীনদের ঐধরণের সভ্যতা চরম বেহায়াপনা ও নোংরামী, যা জানোয়ার ছাড়া কোন মানুষ থেকে কল্পনা করা যায় না। সুতরাং মানুষ নামের পশুরা এটাকে উন্নতি বললেও আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটা ধ্বংসের রাস্তা, যা কিছুদিন পরে তারাও মানতে বাধ্য হবে। রোম ও পারস্যের অস্তিত্ব বহু পূর্বে শেষ হয়েছে। রুশ-বৃটিশের আগ্রাসী থাবা কিছুদিন পূর্বে যেভাবে শেষ হয়েছে, তেমনিভাবে অবশিষ্ট মোড়লদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যও অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে। তখন জ্ঞানপাপীদের চক্ষু উন্মোচিত হবে।

<u>ভ্রান্ত আকীদা-২৭ ঃ</u> বর্তমানে মুসলমানদের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে অনেক খাজা বাবা ও ভাণ্ডারী দরবার শরীফ-এর ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান হাক্কানী উলামায়ে কিরাম থেকে জিজ্ঞাসা না করে দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক রেখে অতি সহজে বেহেশ্‌ত লাভের আশায় তাদের দরবারে ধর্ণা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐসব দুনিয়াদার, ভন্ড, খাজাবাবাদের খপ্‌পরে পড়ে নিজের যতটুকু দ্বীনদারী ও ঈমান-আকীদা ছিল, তাও বিসর্জন দিয়ে দেয়। ঐসব বাবাদের অনেকে নামায-রোযার কোন ধার ধারে না। (তাদের ভাষায়) তাদের নাকি বাতেনীভাবে ঐসব ইবাদত-বন্দেগী আদায় হয়ে যায়। তাদের দরবারে শির্‌ক-বিদ'আত ও গান-বাদ্য, বেপর্দা, মদ-গাঁজা ইত্যাদি চলতে থাকে। তারপরও নাকি তারা আল্লাহ্র বিশিষ্ট ওলী এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

এ ধরনের বিশ্বাসও কুফরী আকীদা। কারণ, শরী'আতের বিধান এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমকে নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিই একমাত্র আল্লাহ্র ওলী হতে পারেন। (সূরাহ্ ইউনুস ঃ ৬২)

যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগীর ধার ধারে না, শির্‌ক-বিদআত, ও বিভিন্ন হারাম

www.nagorikpathagar.org

কাজের মধ্যে মশগুল থাকে, সে কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না। চাই সে যতবড় অলৌকিক ঘটনা দেখাক না কেন, বা সে বাতাসে উড়তে সক্ষম হোক না কেন! এসব জিনিষ আল্লাহর ওলী হওয়ার কোন দলীল নয়। কিয়ামতের পূর্বে যে 'কানা দাজ্জাল' আসবে, সেও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা মানুষদেরকে দেখাবে। অথচ সে আল্লাহর দুশমন। (তিরমিযী শরীফ ও মিশকাত ২ ঃ ৪৭৩)

এ কথা ঠিক যে, সকলের নিজের আত্মার রোগ সমূহের চিকিৎসার জন্য কোন হাক্বানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করা এবং আত্মার রোগের চিকিৎসা করা জরুরী। দিলের রোগের চিকিৎসা না করালে, এর একটা রোগের পরিণতিতে সমগ্র জীবনের ইবাদত-বন্দেগী বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন ইখলাসের অভাবে, রিয়ার কারণে সর্বপ্রথম একজন শহীদ, একজন আলিম ও একজন দানশীলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা খুবই জরুরী। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। দ্বীনদার লোক বলতে যাদেরকে বুঝায়, তাদের থেকেও এটা বিদায় নিয়ে বিলুপ্ত হতে চলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ)কে যে তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তা হচ্ছে–তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকীয়া। এর মধ্যে তাযকীয়া অন্যতম গুরত্বপূর্ণ (সূরাহ্ বাক্বারা ঃ ১২৯, জুমু'আঃ ২) এর জন্য হাক্বানী বুযুর্গের সাহচর্য লাভ করে আত্মশুদ্ধি করাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ফরজে আইন বলেছেন। (আল-ইলম ওয়াল উলামা, ১৮৭)।

হাক্বানী বুযুর্গের আলামত হযরত থানবী (রাহঃ) 'কসদুছ ছাবীল' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

(ক) যিনি মাদ্রাসায় পড়ে বা কোন হাক্বানী বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের উপর চলার জন্য প্রয়োজনীয় ফরজে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি কাজ শরী'আত ও সুন্নাত মুতাবিক।

(খ) যিনি কুফর-শিরক, বিদ'আত, হারাম বা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত নন এবং তিনি অর্থলোভীও নন। যেমন, তিনি তার পায়ে মুরীদকে সিজদার অনুমতি দেন না, ওরস করেন না, গান-বাদ্য শুনেন না, মদ-গাঁজা পান করেন না, দাড়ি-মুন্ডান না বা একমুষ্টির চেয়ে কম করেন না, মহিলাদেরকে বেপর্দা অবস্থায় মুরীদ করা, বেপর্দাভাবে ঝাড়-ফুঁক দেয়া, তাদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকেন। এক কথায় শরী'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন না এবং মুরীদদেরকেও করতে দেন না।

www.nagorikpathagar.org

(গ) সমকালীন যুগের হাক্কানী উলামায়ে কিরাম তাকে হাক্কানী পীর বলে সমর্থন করেন এবং তাকে শ্রদ্ধা করেন। নিজেরা তার নিকট যাতায়াত করেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেন ইত্যাদি।

ভন্ড খাজা-বাবাদের মাঝে এসবের কোন একটি আলামতও পাওয়া যায় না। তাহলে তারা কিভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারে?

<u>ভ্রান্ত আকীদা-২৮ ঃ</u> অধিকাংশ বিদ'আতী লোকেরা বিশ্বাস করে যে, নবী (সাঃ) হাযির-নাযির এবং তিনি গাইব জানতেন। তেমনিভাবে অনেকে তাদের ভন্ড পীর সম্পর্কেও এরূপ আকীদা পোষণ করে যে, তাদের খাজা-বাবা গাইব জানে এবং অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বিপদগ্রস্ত মুরীদদের বিপদের কথা নিজে জেনে তাকে বিপদ মুক্ত করতে পারে।

লোকদের এ ধারণাও স্পষ্ট কুফর ও শির্ক। কারণ, সদা সর্বত্র হাযির-নাযির ও 'আলিমুল গাইব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কোন নবী-রাসূল, পীর-বুযুর্গ সদা সর্বত্র হাযির-নাযির বা আলিমুল গাইব হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ "তাঁর কাছেই গায়বের বা অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।" (সূরাহ্ আন'আম ঃ ৫৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "হে নবী! আপনি বলে দিন-আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের বা ক্ষতি সাধনের মালিক নই; তবে আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়। আর আমি যদি গাইবের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম। তখন কখনো আমার কোন অমঙ্গল হতে পারত না। আমি তো ঈমানদাদের জন্য শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা" (সূরাহ্ আ'রাফ ঃ ১৮৮)

এ ধরনের অনেকগুলো আয়াত কুরআনে কারীমে বিদ্যমান আছে। তেমনিভাবে অনেক সহীহ্ হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে, নবী (সাঃ) বলেন ঃ "আমি তোমাদের পূর্বে হাউজে কাউসারে অবস্থান করব। আমার নিকট যারা পৌঁছবে, তারা হাউজে কাউসার থেকে পা নি পান করবে এবং যারা সেখান থেকে পানি পান করবে, বেহেশতে পৌঁছার পূর্বে আর কখনো তারা পিপাসিত হবে না। তখন কিছু লোক আমার নিকট পৌঁছবে। কিন্তু তাদেরকে তৎক্ষণাত বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এ লোকগুলো তো আমার উম্মত! আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে বলা হবে, আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে যে কত প্রকার নতুন জিনিষ দাখিল করেছে, তা আপনি জানেন না। তখন আমি বলব, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার পরে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে।"

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত ২ ঃ ৪৮৮)

www.nagorikpathagar.org

এ ছাড়াও শাফা'আতে কুবরার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণসহ যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেন, মানুষ সকল নবীগণের (আঃ) থেকে নিরাশ হয়ে হাশরের ময়দানে হিসেব শুরু হওয়ার সুপারিশ নিয়ে যখন আমার নিকট পৌঁছবে, তখন আমি সিজদায় পড়ে এমন শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সানা-সিফাত বর্ণনা করবো, যা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সময় আমাকে শিক্ষা দিবেন এবং তা এমন প্রশংসাবাণী হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে তা কাউকে শিক্ষা দেননি।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ - ৪৮৯)

উভয় হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী (সাঃ) নিজ থেকে গাইব জানতেন না। হাদীসে এ ব্যাপারে এরূপ শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উপর যখন মুনাফিকরা যিনার অপবাদ দিয়েছিল, তখন নবী (সাঃ) দীর্ঘ এক মাস অস্থির ছিলেন। তারপর 'সূরাহ্ নূর'-এর প্রথমাংশ নাযিল হলে নবী (সাঃ) প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। (বুখারী শরীফ ২ ঃ ৬৯৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "যখন খাইবার বিজিত হলো, তখন ইয়াহুদীরা নবী (সাঃ)কে দাওয়াত দিলো এবং বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশ্ত নবী (সাঃ)কে খেতে দিলো। তখন জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ)কে এ ব্যাপারে সতর্ক করার পর তিনি মুখ থেকে গোশ্ত ফেলে দিলেন।" (বুখারী শরীফ ২ ঃ ৬১০)

গাইব জানার অর্থ ঃ কারোর জানিয়ে দেয়া ব্যতীত নিজে নিজে জানা এবং সর্বপ্রকার গাইবের সংবাদ জানা। এ ধরনের জ্ঞান কোন মাখলূককেই দেয়া হয়নি। তবে নবী (সাঃ) যেসব গাইবের কথা জানতেন, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এগুলোর একটিও তিনি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা জানতেন না। আর এটা তার 'নবুওয়াত' বা মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কারণ, নবী হওয়ার জন্য গাইবজান্তা হওয়ার কোন শর্ত নেই। নবীগণ গাইবজান্তা হলে ওহীর কী প্রয়োজন ছিল?

দ্বিতীয়তঃ তিনি সকল প্রকার গাইব জানতেন না। যেমন, ইতিপূর্বে এতদ্সংক্রান্ত অনেক ঘটনা ও হাদীস পেশ করা হয়েছে। সুতরাং নবী (সাঃ) জান্নাত-জাহান্নাম, কবর-হাশর, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সম্পর্কে যত বর্ণনা প্রদান করেছেন, সেগুলোর ইল্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দান করা হয়েছিল। অতঃএব, নবী (সাঃ)কে 'আলিমুল গাইব' বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে নবী (সাঃ)কে শরীক করে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিৎ নয়।

www.nagorikpathagar.org

নবী (সাঃ)-এর নিকট তৎকালীন লোকেরা বিভিন্ন সময় নানা ধরনের প্রশ্ন করত, সেগুলোর জওয়াবের জন্য তিনি ওহী আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। কুরআনে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। সুতরাং যদি নবী (সাঃ) 'আলিমুল গাইব' হতেন, তাহলে জওয়াবের জন্য ওহী নাযিলের অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া কুরআন নাযিল হওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? আর নবী-রাসূলগণ (আঃ) যখন গাইব জানতেন না, তখন কোন পীর কিংবা খাজা-বাবা গাইব জানেন–এরূপ ধারণা অন্তরে পোষণ করা যে কতবড় মূর্খতা, তা বলাই বাহুল্য।

অনেক মূর্খ লোক নবী (সাঃ)কে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করে। তারা মিলাদ মাহফিলের মধ্যে চেয়ার খালি রেখে দেয় এবং হঠাৎ এক সময় সকলে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এগুলো সব মনগড়া কাজ। এর সপক্ষে শরী'আতে কোন দলীল নেই। হুজুর (সাঃ)-এর তিরোধাণের পর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কত দ্বীনী মজলিস করেছেন। তারা নবী (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশী মহব্বত রাখতেন; কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের মজলিসে এরূপ কিয়াম করেন নি। এটা একটা আজব ব্যাপার যে, নবী (সাঃ)-এর প্রকৃত মহব্বতকারী সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) দরূদ পড়ার সময় কখনো কিয়াম না করলেও এসব বিদ'আতীরা দরূদ পড়তে পড়তে এক সময় দাঁড়িয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন জাগে, তারা যখন দাঁড়ায়, তখন কিভাবে বুঝতে পারে যে, এ মুহূর্তে নবী (সাঃ) আসছেন–যদ্দরুন এখন দাঁড়ানো প্রয়োজন? এবং যখন একটু পরে তারা বসে পড়ে, তখন কি করে বুঝে যে, নবী করীম (সাঃ) এখন চলে গেছেন; সুতরাং এখন বসা দরকার? হাস্যকর ব্যাপার যে, তারা যখন বলে–রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সদা সর্বত্র হাজির-নাজির, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রস্থান অনুমান করে বসে যায় কিভাবে? যিনি সদা সর্বত্র হাজির-নাজির, তার আবার প্রস্থান হয় কি করে? কেননা, তিনি তো সদা হাজিরই থাকবেন। দেখা যাচ্ছে–তাদের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। বলা বাহুল্য, মীলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমণ-প্রস্থানের এ ধরণের আকীদা পোষণ করা শির্ক-মহাপাপ।

শরী'আতের দৃষ্টিতে, দাঁড়িয়ে বা বসে সব অবস্থায়ই দরূদ শরীফ পড়া যায়। তবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবীজী (সাঃ) সকলকে নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কারণে নামাযের আখিরী বৈঠকে তাশাহহুদের পর বসাবস্থায়ই দরূদ শরীফ (আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা...) পড়া হয়ে থাকে। সুতরাং বসে দরূদ শরীফ পড়া যে উত্তম, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ

www.nagorikpathagar.org

থাকতে পারে না। আর সকলের সম্মিলিতভাবে একই সুরে অশুদ্ধ উচ্চারণে দরূদ পড়ার পদ্ধতিও শরী'আতে প্রমাণিত নয় এবং শব্দ ও অর্থগত ভুলসহ 'ইয়া নবী' ওয়ালা দরূদ-সালাম পড়াও ঠিক নয়। হাদীসের কিতাবে সহীহ্ দরূদের কোন অভাব আছে কি? তাছাড়া মীলাদের নামে একটা মাহফিলে দ্বীনের কোন আলোচনা নেই, সুন্নাতের কোন বর্ণনা নেই, অথচ আরবী, ফার্সী, বাংলা ও উর্দু ভাষার কিছু কবিতা পাঠ করা হলো, কয়েকবার ভুল-অশুদ্ধ উচ্চারণে ও গলদ তরীকায় কয়েকবার দরূদ-সালাম পড়া হল, আর তাকে মহা-ইবাদত ও পূণ্যের কাজ মনে করা হল, ব্যস। বস্তুতঃ এটা দ্বীনের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং কিছু অর্থলোভী মৌ-লোভীদের রোজগারের হাতিয়ার মাত্র। দ্বীনের সাথে এগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আর আখিরাতে এসব আমলের বিনিময়ে কোন সওয়াবের আশাও করাও অবান্তর। বরং ভূয়া ইশ্কে রাসূলের নামে এ সকল গর্হিত বিদ'আতী কর্মকান্ডের কারণে পরকালে তারা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সুতরাং এ জাতীয় দ্বীনের নামে ধোকা মূলক যাবতীয় কার্যকলাপ হতে সকল মুসলমানের বেঁচে থাকা কর্তব্য।

কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

ভ্রান্ত আকীদা-২৯ ঃ অনেক মূর্খ লোক বিভিন্ন ভন্ড পীর ও খাজা-বাবাদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, তারা কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে যত রকম সমস্যা আছে, সব সমস্যা থেকে মুরীদদেরকে পার করে নিয়ে যাবেন এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদেরকে বেহেশ্তে নিবেন। তাদের বাবারাও বলে থাকেন যে, আমার কোন মুরীদকে পুলসিরাতে রেখে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করবো না।

এসব আকীদা পোষণ করা এবং এরূপ দাবী করা কুফরী কাজ। কোন মানুষ নিজের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে, সে জান্নাতী। স্বয়ং নবী (সাঃ) বলেছেন, "খোদার কসম, আমি জানি না যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কি ফয়সালা? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল।" (বুখারী শরীফ, ১ ঃ ১৬৬)

এ কারণে কেউ নিজের সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার দাবী করতে পারে না। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আশা পোষণ করা যায়। কাজেই আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত এবং বেহেশ্তের আশা রাখা উচিত।

তেমনিভাবে অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা তো শরী'আতের নির্দেশ; কিন্তু এমন বিশ্বাস রাখা বা দাবী করা নিষেধ যে, অমুক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ওলী

www.nagorikpathagar.org

বা জান্নাতী। তবে যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাদেরকে জান্নাতী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বুযুর্গ বা আল্লাহর ওলী হয়ে যান, তাহলে তাদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিলে, তারা লোকদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। তবে কেউ নিজের পক্ষ থেকে এরূপ দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। কেননা, যাদের প্রতি খুশী হয়ে আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, কেবলমাত্র তারাই সুপারিশ করতে পারবেন। আর সেটা এমন হবে, যেমন দুনিয়াতে একজন সাধারণ মানুষ বাদশাহের দরবারে সুপারিশ করেন। বাদশাহ এ সুপারিশ কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সুতরাং কেউ তার মুরীদকে সুপারিশ করে নিশ্চিতভাবে বেহেশ্তে নিয়েই যাবে-এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী।

ভ্রান্ত আকীদা-৩০ ঃ অনেকে নিজের বুযুর্গী জাহির করার জন্য দাবী করে থাকে যে, তারা দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখে থাকে। আবার অনেক প্রতারক-ভন্ড লোকদেরে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি ৭০/৮০ বৎসর যাবৎ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করছ, কত বার আল্লাহ্কে দেখেছ? উত্তরে সেই ব্যক্তি যদি বলে, আমি একবারও তো আল্লাহ্কে দেখতে পাইনি, তখন বলা হয় যে, তাহলে তো তোমার ইবাদত-বন্দেগী কিছুই হলো না। তুমি যদি সঠিকভাবে নামায পড়তে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হতে।

লোকদের এরূপ আকীদাও কুফ্রী। কতিপয় ভন্ড পীর ও খাজা-বাবারা লোকদেরকে সহজে নিজের দলে ভিড়ানোর জন্য এরূপ ফঁন্দি করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "দুনিয়াতে কোন চর্ম চক্ষু আল্লাহ্কে দেখতে পারে না।" (সূরাহ্ আন'আম ঃ ১০৪)

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসার আবেগে বিহবল হয়ে যখন তাঁর দীদার প্রার্থনা করলেন, তখন জওয়াবে ইরশাদ হলো-"হে মুসা! কস্মিন কালেও দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পারবে না।" (সূরাহ্ আ'রাফ ১৪২) হাদীস শরীফে এসেছে যে, "জেনে নাও, তোমরা কখনো চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারবে না। হ্যাঁ, মৃত্যুর পর মুমিনরা হাশরের ময়দানে এবং বেহেশ্তের মধ্যে বেহেশ্তী চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে দেখতে পারবে। বরং জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ।" (মুসলিম শরীফ ১ ঃ ১০০)

www.nagorikpathagar.org

মুমিনরা দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে না–এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ রাববুল আলামীন-এর হেজাব বা পর্দা এমন নূরের, যা আমাদের কল্পনার বহির্ভূত। সে নূরকে কোন চর্মচক্ষু বরদাশতও করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার হেজাবের নূরের তুলনায় সূর্যের আলো কিছুই নয়। অথচ সেই সূর্যের দিকে চর্মচক্ষু দ্বারা তাকানোই যখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে কিভাবে দেখা সম্ভব? তবে বেহেশ্তের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ শক্তির অধিকারী করে জান্নাতীদের তৈরী করবেন। তখন তাদের মাঝে আল্লাহ্র দর্শন লাভের ক্ষমতা দান করা হবে। সুতরাং তখন তারা উক্ত নেয়ামত লাভে ধন্য হতে পারবেন।

অবশ্য দুনিয়াতে স্বপ্নের মধ্যে কেউ আল্লাহ্কে কোন আকৃতিতে দেখতে পারে, বা খাবের মত অবস্থা যাকে "ইসতিগরাকী কাইফিয়্যাত" বলা হয়, সে অবস্থায়ও কেউ কেউ আল্লাহ্কে অন্তরচক্ষু দ্বারা মুশাহাদা করতে পারে, সেটা সম্ভব। যেটা সম্ভব নয়, তা হলো–জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে দেখা। সুতরাং কেউ যদি এরূপ দাবী করে, তাহলে তাকে মিথ্যুক, গোমরাহ্ ও কুফরী আকীদাওয়ালা বলা হবে। তার থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

তাকদীরের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা

<u>ভ্রান্ত আকীদা–৩১ ঃ</u> **অনেক মূর্খ লোক আছে, যারা ইবাদত-বন্দেগী, নামায-রোযার ধার ধারে না, সময় পেলেই তাকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেয় এবং এমন কথা বলতে শুরু করে, যা ঈমানের জন্য হুমকী স্বরূপ; যেমন, তারা বলে–সবকিছুই যখন আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন, তাহলে চোরের কি দোষ? মদ খোরের কি দোষ? আল্লাহ্ তা'আলা যখন, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী তা লিখে রেখেছেন, তাহলে ইবাদত-বন্দেগী করে লাভ কি? আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে সৃষ্টি করলেন কেন? ইত্যাদি বিভিন্ন অমূলক প্রশ্ন তারা করে থাকে।**

এ ধরনের প্রশ্ন ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যা করেন, তার বিরুদ্ধে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।" (সূরাহ্ আম্বিয়া ঃ ২৩) সুতরাং আল্লাহর বিরুদ্ধে এ ধরনের আপত্তি ও অভিযোগ করা কুফরী কাজ। মানুষের কামিয়াবী আল্লাহর হুকুম-আহকামকে সরল অন্তকরণে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং কোন যুক্তি-তর্ক বা অভিযোগ

www.nagorikpathagar.org

উত্থাপন না করে আল্লাহর প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, তিনি যা বলেন, যা করেন, যে আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন–সবই সহীহ, সঠিক ও বান্দাহর জন্য মঙ্গলজনক। এর মধ্যে বান্দাহর অনিষ্টের কিছুই নেই। তাকদীরের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান এই যে, ঈমানের অঙ্গ হিসেবে মনে-প্রাণে তা মেনে নেয়া এবং এ ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা বা কল্পনাপ্রসূত কোন তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনা না করা কর্তব্য। নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আকল-বুদ্ধি দ্বারা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বহস করল, তাকে কিয়ামতের দিবসে এ জন্য জওয়াবদিহী করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাকদীরের ব্যাপারে কোন তর্ক বহস করল না, তাকে এ জন্য কিয়ামতের দিবসে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। (ইবনে মাজাহ ও মিশকাত ঃ ২৩)

অপর এক হাদীসে এসেছে, একদিন নবীজী (সাঃ) বাইরে আসলেন। তখন কতিপয় সাহাবী (রাঃ) তাকদীর-এর ব্যাপারে তর্ক করছিলেন। তা দেখে নবী (সাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি বলতে লাগলেন, "তোমাদের কি এ বিষয়ে বহস করার আদেশ দেয়া হয়েছে? না আমাকে এ বহস করার জন্য তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না"। (তিরমিযী শরীফ ও মিশকাত ঃ ২২)

সুতরাং এ ধরনের আপত্তিকর কথাবার্তা কোন ক্রমেই না বলা উচিত। এ ধরণের উদ্ভট প্রশ্নকারীদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই সব কিছু জেনে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করে থাকলে, তাতে আমাদের কি? আমরা তো আর সে লেখা দেখিনি বা জানিও না। তাছাড়া তিনি পূর্ব হতে লিখে রাখার দরুণ আমাদের শক্তি তো লোপ পায় নি। আমাদেরকে তিনি ভাল-মন্দ বুঝার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার শক্তি দান করেছেন এবং ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ না করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা অতি ক্ষুদ্র মখলুক ও তাঁর দাস। সুতরাং তিনি আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন, তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করে নেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তিনি কি লিখে রেখেছেন, তা আমাদের দেখার বিষয় নয়; বরং তাঁর হুকুম তামিল করাই আমাদের দায়িত্ব। তাঁর প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করলে, কিংবা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে, এ নাফরমানীর দরুণ নিশ্চয় তার নিকট জওয়াবদিহী করতে হবে এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তির সহীহ ব্যবহার করলে, তাঁর আদেশ

www.nagorikpathagar.org

পালন করলে, তিনি তার উত্তম প্রতিদান দিবেন।

বিস্ময়ের কথা হলো যে, তাকদীরের দোহাই দিয়ে লোকেরা আখিরাতের জন্য নেক কাজের চেষ্টা-তদবীর বন্ধ করে বসে থাকে এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর খুবই ভরসা ও তাওয়াক্কুল রয়েছে বলে প্রকাশ করে; কিন্তু দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-রোজগার, উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাদের এ ভরসা কোথায় যায়? এ সব ব্যাপারে তো কোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকতে দেখা যায় না; বরং দুনিয়ার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত হুশিয়ার, খুবই কর্মঠ। যত রকম চেষ্টা-তদবীর আছে, কোন কিছুই তখন আর বাদ থাকে না। অথচ ঐসব ব্যাপারও তো সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন যে, তার রিযক কি পরিমাণ হবে। সে চেষ্টা করুক আর নাই করুক, ঐ পরিমাণ রিযক তার ভাগ্যে জুটবেই। (সূরাহ্ বনী ইসরাঈল ঃ ১৮) এবং শত চেষ্টা-তদবীর করেও তার থেকে এক বিন্দু পরিমাণ রিযকও সে বাড়াতে পারবে না।

(সূরাহ্ বনী ইসরাঈল ঃ ৩০)

উল্লেখ্য যে, মানুষ যতই মেহনত করুক, রিযিকের ব্যাপারে তার ভাগ্যের নির্ধারিত পরিমাণ ঠিকই থাকবে। তবে কেউ ধৈর্য ধারণ করলে হালাল পন্থায় অর্জন করবে, আর কেউ অধৈর্য হয়ে জায়িয-নাজায়িযের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হারাম পন্থায় তা উপার্জন করবে। প্রশ্ন হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় বিষয় যখন লেখা আছে, তাহলে একটার ব্যাপারে এত চেষ্টা-তদবীর এবং দ্বিতীয়টির প্রতি এত উদাসীনতা কেন? যদিও সে আল্লাহর উপর ভরসা দেখাচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে কি তাই? আসল কথা হলো, তাকদীরের ব্যাপারে আমাদের ঈমান বড় দুর্বল। আখিরাতের ব্যাপারে, জান্নাতের ব্যাপারে বিশ্বাস বড় কমজোর এবং আগ্রহের খুবই অভাব। কারণ, অধিকাংশ লোক ঈমান হাসিল করা, তা সহীহ্-শুদ্ধ করা ও পাকা-পোক্ত করার ব্যাপারে চরম উদাসীন। এটাকে তারা কোন কাজই মনে করে না; এর প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না এবং এর জন্য কোন মেহনতের প্রয়োজনীয়তও অনুভব করে না; বরং পৈত্রিক সূত্রে যে মুসলমানী নাম লাভ করেছে, তাকেই মুমিন ও মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করে। মুসলিম মিল্লাতের অধঃপতনের জন্য একে মৌলিক কারণ বললে ভুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের সহী বুঝ দান করুন।

<u>ভ্রান্ত আকীদা-৩২ ঃ</u> ধন-সম্পদ ও উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে কিছু লো বলতে শুরু করেছে যে, এগুলো ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যা

www.nagorikpathagar.org

চালাক-চতুর, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পলিসি ও টেকনিক জানা আছে, তারাই নিজ গুণে এজাতীয় উন্নতি করতে পারে এবং অঢেল সম্পদের অধিকারী বা বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়া তাদের জন্য কোন ব্যাপারই নয়।

তাদের এ চিন্তাধারা আল্লাহর দুশমন কারূণের চিন্তা ধারার ন্যায়। (সূরাহ্ কাসাস ঃ ৭৮) কুরআনের বহু আয়াতে রিয্ক ও ধন-দৌলতকে আল্লাহর ফয়সালার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কোন একটি আয়াতেও মানুষের চেষ্টা-তদবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নি। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস কুফরী আকীদা। এর থেকে তাদের তওবা করা ফরজ।

এ অধ্যায়ে যে সব ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদার আলোচনা করা হল, তার দ্বারা উদ্দেশ্য–মুসলমান ভাইদের ঈমান-আকীদার হিফাজত করা। প্রত্যেকে যেন এসব ভ্রান্ত আকীদা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। খোদা না করুন, কেউ অজ্ঞতাবশতঃ যদি এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি সেগুলো অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে উক্ত ভ্রান্ত আকীদা পরিহার করে খালিসভাবে তওবা করে নিবেন।

জরুরী হুশিয়ারী ঃ এ কিতাব পড়ে কারোর মধ্যে এমন কুফরী আকীদা প্রত্যক্ষ করলে, যার পোষণকারীকে এ কিতাবে কাফির বলা হয়নি, তাকে কাফির বলবেন না, বা কাফির ফাতওয়া দিবেন না। কারণ, কুফরের মধ্যে স্তর আছে; কোনটা উপরের স্তরের, আবার কোনটা নীচের স্তরের। উপরের স্তরের কুফর কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে, সে ব্যক্তি কাফির ও বেদ্বীন হয়ে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের কুফর কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে যদিও উক্ত আকীদা নিঃসন্দেহে কুফর এবং তার পোষণকারী স্পষ্টভাবে কাফির না হলেও নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, বিদআতী, ফাসিক ও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ; হাদীসে তাদেরকে ৭২ ফিরকার অন্তর্ভূক্ত ও জাহান্নামী বলা হয়েছে, কিন্তু কুফ্রের এসব স্তর নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়, একমাত্র বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উলামা ও মুফ্তীগণই এগুলো নির্ণয় করতে পারেন। সুতরাং যেসব আকীদা পোষণকারীকে এ কিতাবে কাফির বলা হয়নি, সে ধরণের কোন আকীদার হুকুম জানার প্রয়োজন পড়লে, বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্তীগণ থেকে জেনে নিবেন বলে আশা করি। প্রত্যেকে নিজে আন্দাজ-অনুমান করে দ্বীনের ব্যাপারে কিছু বলবেন না। এটা মহা অপরাধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না।' (সূরাহ্ বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

www.nagorikpathagar.org

ভ্রান্তি নিরসন

রাসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামের সামনে যে দ্বীন পেশ করেছিলেন, তা পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছানোর প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন সাহাবায়ে কিরাম(রাঃ)। সে হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) উম্মতের নিকট দ্বীন পৌঁছার মূল ভিত্তি। তাঁদের পর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাবিয়ীন, তাবে-তাবিয়ীন ও পর্যায়ক্রমে সমকালীন যুগের হাক্কানী উলামায়ে কিরামের উপর। আর সে জন্যই ইসলাম বিদ্বেষীরা এসব মহামনীষীর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়াছে। সাহাবা (রাঃ) ও উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। যাতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে নানা রকম সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম প্রচারের মূল ভিত্তিই নড়বড় হয়ে যায়। তাই মুসলিম উম্মাহকে এরূপ ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 'ভ্রান্তি নিরসন' নামে নিম্নে পৃথক তিনটি বিষয় সংযোজিত হল ঃ

ভ্রান্তি নিরসন-১ ঃ সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ বাকারায় (আয়াত নং ১৩ ও ১৩৮) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) দ্বীন ও ঈমানের কষ্টি পাথর ও নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। তেমনিভাবে নবী কারীম (সাঃ) উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ৭৩ ফিরকার মধ্যে একটি মাত্র নাযাত প্রাপ্ত জামা'আতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজের সাথে সাহাবায়ে কিরামকে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য। এদের থেকে তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে।" (মিশকাত ২ ঃ ৫৫৪) এ হাদীসটি শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এসব সূত্রের মধ্য হতে কোনটির শুধু শব্দের ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস কিছুটা আপত্তি করলেও তারা অর্থের ব্যাপারে কোনরূপ আপত্তি করেননি। অথচ তাঁদের সে আপত্তিকে না বুঝে অনেকে এতদ্সম্পর্কে বর্ণিত সকল সূত্রকে বাতিল বলে প্রচার করে। এটা তাদের চরম মূর্খতা । কোন একটা সূত্রের উপর আপত্তির কারণে অবশিষ্ট সবগুলো সূত্র কখনো বাতিল হতে পারে না। তেমনিভাবে অবশিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত হাদীস সমূহও বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত হয় না। যা হোক, নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে, যার সারমর্ম হলো-সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি স্বরূপ। তাঁরা কিয়ামত

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ। ঈমানের সাথে একবার যিনি নবী (সাঃ)কে দেখেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল ওলী-বুযুর্গ মিলে তাঁর সমতুল্য হবেন না। সুতরাং এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাঁদের মর্যাদা কত অধিক।

অপর দিকে নবী কারীম (সাঃ) তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা কিংবা তাদের বিরূপ সমালোচনা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমন কি তিনি বলেছেন, "আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার ইনতিকালের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল, তার গ্রেফতারী অতি নিকটেই।" (মিশকাত ২ঃ ৫৫৪) এর দ্বারা বুঝা যায়–সাহাবীগণের সমালোচনা করা কত বড় মারাত্মক ব্যাপার! যে ব্যক্তি সাহাবীগণের সমালোচনা করলো, সে এটা প্রমাণ করে দিল যে, তার অন্তরে নবী (সাঃ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষ আছে। আর সেটার বহিঃপ্রকাশের জন্যই সে সাহাবীগণের সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করুন। অপর একটি হাদীসে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমরা যখন কাউকে সাহাবীগণের সমালোচনা করতে দেখ, তখন বলে দাও যে, তোমাদের ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদের উপর অর্থাৎ সমালোচনাকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত। (মিশকাতঃ ২ ঃ ৫৫৪)

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, একদিকে সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। অপর দিকে তাঁদের সমালোচনা করা হারাম, অনেক ক্ষেত্রে কুফরও বটে। আর তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও ভালবাসা ঈমানের অংশ। নবী (সাঃ)-এর কথাগুলো তাঁদের মাধ্যমেই উম্মতের নিকট পৌঁছেছে। এসব দিক লক্ষ্য করেই উলামায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ইতিহাস মানুষ কর্তৃক রচিত, এর মধ্যে আবার অনেকগুলোই ইসলামের দুশমনদের দ্বারা লিখিত। সুতরাং এসব ইতিহাসনির্ভর তথ্যের উপর যাচাই-বাচাই ছাড়া পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাই ইতিহাসের যে অংশটুকু কুরআন ও সুন্নাহ-এর সাথে সংঘাতপূর্ণ নয় এবং সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, শুধুমাত্র ততটুকু গ্রহণ করা

www.nagorikpathagar.org

হবে। অবশিষ্ট অংশ কোনক্রমেই গ্রহণ করা হবে না।

ঈমান-আকীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এরই উপর পরকালে মানুষদের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে ঈমানের উপর আঁচড় আসতে দেয়া কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে শোভা পায় না। ফলতঃ সাহাবীগণ নির্ভরযোগ্য গণ্য না হলে, সম্পূর্ণ দ্বীনের বুনিয়াদই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, আমরা দ্বীন পেয়েছি সাহাবীগণেরই মাধ্যমে।

কেউ বলতে পারেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত মা'য়িয (রাঃ)-এর দ্বারা যিনা সংঘটিত হওয়া এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখ আছে। তেমনিভাবে অপর এক সাহাবীর মদ্য পান এবং তাকে শাস্তিদানের কথা উল্লেখ আছে। আর উভয় ঘটনাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে সাহাবীগণ কিভাবে সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন? তাছাড়া তাঁদের দ্বারাই তো সংঘটিত হয়েছে জংগে জামাল, জংগে সিফফীন-এর ন্যায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। তাহলে তাঁদেরকে কিভাবে সত্যের মাপকাঠি রূপে মেনে নেয়া যায়? তাদের এরূপ মন্তব্যের উত্তরে উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ

(ক) নবী (সাঃ)-এর মত সাহাবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ নন্। তবে দ্বীনের জন্য অকল্পনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাত ও জান্নাত প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। (সূরাহ্ তওবা ঃ ১০০) সুতরাং তারা মা'সূম না হলেও নিঃসন্দেহে তারা মাগফিরাত প্রাপ্ত ও জান্নাতী। তাই পরবর্তীদের জন্য শুধু তাঁদের ভালো আলোচনার অনুমতি দেয়া হয়েছে; সমালোচনার অনুমতি কোন ক্রমেই দেয়া হয় নি। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রত্যেকে নিজের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, সে দ্বীনের জন্য কতটুকু কুরবানী করেছে, নিজেকে কতটুকু গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতিনিয়ত যে ব্যক্তি ভুল করেই চলেছে, তার জন্য কি মাগফিরাতপ্রাপ্ত জান্নাতী মনীষীবৃন্দের সমালোচনা করা শোভা পায়? দ্বীন বুঝতে বা কায়িম করতে কি এ ধরণের সমালোচনার কোন প্রয়োজন পড়ে? আর যদি তা না-ই হয়, তাহলে কোন্ প্রয়োজনে তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো? সমুদ্রে নাপাক পড়লে, পেশাব পড়লে যেমন সমুদ্র নাপাক হয় না; বরং নাপাক তার অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সাহাবীগণ তাঁদের অসাধারণ কুরবানীর বদৌলতে ছিলেন নেকীর সমুদ্র। সুতরাং তাদের দু'একজনের জীবনে যদি অসাবধানতা বশতঃ দু'একটি গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সে কারণে তাঁদের সমগ্র জীবনের কুরবানী থেকে চক্ষু

www.nagorikpathagar.org

বন্ধ করে তাঁদের সমালোচনা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

(খ) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যদি কোন গুনাহ করে ফেলেন, তাহলে তাতে কি এ বিশাল জামা'আতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে কি তাঁদের সত্যের মাপকাঠি ও উম্মতের পথ প্রদর্শক হওয়া বাতিল হয়ে যায়? দু'একজন থেকে যে ভুল হয়েছে, তাতো হাদীসে ভুল হিসেবে বা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিতই করা হয়েছে। সুতরাং সেই ভুলের ব্যাপারে তাদেরকে অনুকরণ বা অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আর এরূপ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে কত হিকমত নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। নবী করীম (সাঃ)কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধু আল্লাহ্র আহকাম বর্ণনা করার জন্য নয়; বরং প্রত্যেক আহকামের বাস্তবরূপ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। তাই খোদা না করুন, যদি কোন রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমত কায়িম থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির থেকে যিনা বা মদ পানের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তা প্রমাণ করার পদ্ধতি এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি প্রয়োগের নিয়ম কি হবে, এটা উম্মতের সামনে আসার জন্য এরূপ দু'একটি ঘটনা পথ নির্দেশনারই শামিল। তাছাড়া একজন মুমিন থেকে যদি ভুলক্রমে বা শয়তানের প্রবঞ্চনায় গুনাহ হয়ে যায়, তখন সেই ঈমানদারের মানসিক অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিৎ এবং গুনাহ থেকে নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্য কতটুকু পেরেশান হওয়া উচিৎ, এরও একটা নমুনা সেই ঘটনাসমূহ দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য করলে, এরূপ দু'একটি ঘটনার হিকমত বুঝা যায় এবং একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐ ভুলের ব্যাপারে উম্মত তাঁদের অনুকরণ করবে না বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় তার মানসিক অবস্থা ও খোদার প্রতি ভয়-ভীতি কিরূপ প্রকাশ পাওয়া উচিত, সে ব্যাপারে উক্ত সাহাবী তার জন্য দৃষ্টান্ত এবং অনুকরণীয় হবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র কাজের মধ্যে কত হিকমত থাকতে পারে! হযরত মা'য়িয (রাঃ) থেকে যিনা হওয়ার পর তিনি নিজেই নবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্র নবী! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমাকে পবিত্র করুন!" অথচ তিনি নিজে না বললে এ ঘটনা প্রকাশ পেতনা। একমাত্র খোদার ভয়ে তিনি এত পেরেশান হয়েছিলেন যে, নিজেকে পাক-পবিত্র করার জন্য নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। নবী (সাঃ) তাকে বললেন, মা'য়িয! তুমি হয়ত তাকে স্পর্শ করেছ বা চুমো দিয়েছ? তিনি বললেন, না, আমি যিনা-ই করে ফেলেছি। চার বার স্বীকারোক্তির পর নবী (সাঃ) তাকে সঙ্গেসার করার বা পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি অপরাধ

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু তারপরও তিনি আমাদের ন্যায় অপরাধকারী সকল উম্মতের জন্য গুনাহ্ মাফ করানোর ব্যাপারে নমুনা বা আদর্শ হয়ে আছেন।

(গ) সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক জংগে জামাল, জংগে সিফ্ফীন সংঘটিত হয়েছিল–এ কথা ঠিক, কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে যে, তারা ক্ষমতা দখলের জন্য বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেছিলেন? এ সম্পর্কে যাদের যথার্থ জ্ঞান রয়েছে, তারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, উভয় জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র বিধান কায়িম করা। আর এ জন্য তাঁরা সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণের উভয় জামা'আতের মাঝে মুনাফিক 'আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা'র বাহিনী এমনভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল, যাথেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। এ ক্ষুদ্র পরিসরে সে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সার কথা, সাহাবীগণের উভয় দলের মধ্যে কোন দলই দুনিয়াবী স্বার্থে এসব যুদ্ধ করেননি। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন। আপাতঃ দৃষ্টিতে একদলের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলে, অপর দলের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে সমালোচনা করা যাবে না। কারণ, এটা ভুল গণ্য হলেও তা ছিল ইজতিহাদী ভুল–যা ক্ষমার্হ। এ কারণে উভয় জামা'আত থেকে যারা সেসব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের সকলকে শহীদ বলা হয় এবং বহু বৎসর পর বিশেষ কারণে যখন তাঁদের কবর খনন করা হয়, তখন তাঁদের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ ঃ ২৫৯)। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে, এটা শাহাদতের আলামত। তাঁদের এ শাহাদত প্রমাণ করে যে, তাঁরা দুনিয়ার লোভে এসব যুদ্ধ করেন নি; বরং দ্বীনের জন্য করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার ইলমে অবশ্যই ছিল এবং এসব ঘটনা সামনে রেখেই তিনি সাহাবীগণের ব্যাপারে রাজী হওয়ার এবং তাঁদের জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরও আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই মহান সাহাবীগণের সমালোচনা ও দোষচর্চার কি অধিকার থাকতে পারে? প্রত্যেকে যদি নিজের দোষ সংশোধনের চিন্তা করে, তাহলে কেউ এমন মহান ব্যক্তিবর্গের দোষচর্চা তো দূরের কথা, একজন সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসলমানের দোষ চর্চায়ও লিপ্ত হতে পারে না। উপরন্তু এরূপ আলোচনা 'গীবত' হওয়ার কারণে শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। যারা নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিজের ঈমান-আকীদার খবরও যাদের কাছে নেই, তারাই এরূপ হারামে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

প্রত্যেকে নিজের বাপ-দাদার ব্যাপারে কত হুশিয়ার! কেউ তার বাপ-দাদার

www.nagorikpathagar.org

অন্যায় সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না। অথচ সাহাবীগণের ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ করা আমাদের পিতা-মাতা ও দাদা-নানার ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণের চেয়েও লক্ষ-কোটি গুণ বেশী জরুরী। মুসলমান হয়েও কিভাবে সাহাবীগণের দোষ চর্চা করতে পারে, বা দোষ চর্চা শুনে বরদাশত করতে পারে, তা বোধগম্য নয়।

ভ্রান্তি নিরসন-২ ঃ বর্তমানে অনেক নব্য শিক্ষিত লোক আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বুঝে বা না বুঝে তাদের গুরুদের অনুকরণে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে সমালোচনা করে থাকে। অথচ উলামায়ে কিরাম দ্বীনের কাজ করছেন, তাঁরা ওয়ারাসায়ে রাসূল (সাঃ), তাই তাঁদেরকে গালি দেয়া, তাঁদেরকে হেয় করা, তাঁদের সমালোচনা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কুফরী কাজ। এতে ঈমান চলে যায়। আর ঈমান চলে গেলে অতীত জীবনের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে; বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর পর কবরে তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে আপনা আপনি অন্য দিকে ফিরে যাবে বলে হাদীসে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে হিফাজত করুন।

তাদের সেই সকল অভিযোগ মূলতঃ ভ্রান্তিপ্রসূত। সেই ভ্রান্তি নিরসনে তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জওয়াব নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমরা অভিযোগগুলো উল্লেখ পূর্বক তার জওয়াব এ জন্য প্রদান করছি, যাতে করে তাদের অভিযোগের যবণিকাপাত হয় এবং এর দ্বারা আলেম সমাজের দোষারোপ করা থেকে দূরে থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের ঈমান বাঁচাতে পারেন।

প্রথম অভিযোগ ঃ তারা অভিযোগ করে–উলামায়ে কিরাম মাদরাসার মধ্যে শুধু কুরআন-হাদীস কেন শিক্ষা দেন? এর সাথে বিভিন্ন রকম কারিগরী বা হস্ত শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিতে তাদের বাধা কোথায়?

জওয়াব ঃ অভিযোগকারীরা মূলতঃ কওমী মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বে-খবর। এজন্য তাদের মধ্যে এই আপত্তি উঠেছে। তাহলে শুনুন, দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত না হলে দুনিয়াতে কোন জিনিষই ভালভাবে টিকে থাকতে পারে না। বরং কিছুদিন পরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। দ্বীন ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। সুতরাং এ নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য প্রত্যেক যমানায়, প্রত্যেক এলাকায় বিজ্ঞ ও পারদর্শী হাক্কানী উলামায়ে কিরামের বড় একটি জামা'আত বিদ্যমান থেকে সহীহ্ভাবে দ্বীনের সকল বিভাগে খিদমত আঞ্জাম দেয়া জরুরী। কওমী মাদরাসাগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–মুসলিম মিল্লাতের এ

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনী দায়িত্ব ও চাহিদা পুরণের জন্য হাক্কানী ও আল্লাহওয়ালা বিজ্ঞ উলামা দল সৃষ্টি করা, যাতে দ্বীন-ইসলামের স্থায়িত্ব ও প্রচার-প্রসারে এবং মুসলমানদের দ্বীনী প্রয়োজন মিটাতে কোন ক্ষেত্রে কোন রকম সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আলহামদুলিল্লাহ্, এ লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কওমী মাদরাসাসমূহ নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারই বদৌলতে চরম ফিতনার এ যুগে এখনো মুসলমানগণ সহীহ দ্বীন-ঈমান নিয়ে টিকে আছেন। এখন যদি কওমী মাদরাসা সমূহের সিলেবাসে হস্ত শিল্প, কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আর বিজ্ঞ পারদর্শী উলামা সৃষ্টি হবে না। যেমন সরকারী মাদরাসা থেকে হচ্ছে না এবং এটা কখনো সম্ভবও নয়। কারণ, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুগভীর। প্রখর মেধাবী ছাত্র যদি একনিষ্টভাবে এ জ্ঞান অধ্যয়ন করে, তাহলে সে এটা আয়ত্তে আনতে পারবে। কিন্তু দ্বীনী ইল্‌মের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ের মিশ্রণ ঘটালে, তার পক্ষে আর কোনভাবেই এটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হবে না। কথায় বলে, "তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।" সুতরাং তখন যেসব নামকে ওয়াস্তে আলেম তৈরী হবে, তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম টিকে থাকবে না এবং তাদের থেকে জনগণ সহীহ দ্বীনও পাবে না। তাই দ্বীন রক্ষার স্বার্থেই কওমী মাদরাসায় কুটির শিল্প, কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রবেশ করানো হয় না।

বিষয়টি আরো পরিস্কার করে বুঝাবার জন্য অভিযোগকারীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, আপনারা এ ধরণের প্রস্তাব কেন দিচ্ছেন না যে, মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তার তৈরী করা হচ্ছে কেন? সেখানে কিছু কমার্সের সাবজেক্টও ঢুকানো হোক। যাতে তাদের মধ্যে দু'ধরনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-ভার্সিটিগুলোতে মেডিকেল সায়েন্স প্রবেশ করানো হোক। যাতে করে তারা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারও হতে পারে। ফলে তারা জাতির জন্য দ্বিগুণ খিদমত আঞ্জাম দিতে পারবে।

আজ পর্যন্ত কোন পাগলও এ ধরনের চিন্তা করেছি কি? নিশ্চয় নয়। কারণ কি? কারণ এটাই যে, এতে দু'টোর কোনটাই ভালভাবে হবে না। তাহলে মাদ্রাসার ব্যাপারে আপনাদের এধরণের বে-ওকূফী প্রস্তাব কেন?

আসল কথা হচ্ছে, সেই অভিযোগকারীরা দ্বীনী ইল্‌মের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করে না। জেনে রাখুন, সকলের জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেকের উপরই ফরজ। প্রত্যেক মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিবিদের জন্য ইলমেদ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

কোন আলেমের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরী নয়, বরং এটা সমীচীনও নয়। কারণ, দুই লাইনের খিদমত কেউ কখনো একসঙ্গে আঞ্জাম দিতে পারবে না। যে কোন একটা পূর্ণভাবে পালন করলে, অন্যটা বাদ পড়তে বাধ্য। সুতরাং উলামায়ে কিরামকে এ ধরনের অনর্থক পরামর্শ না দিয়ে তারা যদি স্কুল-কলেজে গিয়ে সেখানকার সিলেবাসে ফরজে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীনের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন, তাহলে সেটা হবে সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির কল্যাণ কামনা। তাতে মুসলিম ছেলেদের দ্বীন ও ঈমানের হিফাজত হবে। মুসলিম সন্তানরা খৃষ্টানী ও হিন্দুয়ানী কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত বা প্ররোচিত না হয়ে ইসলামের দিকেই ধাবিত হতে থাকবে। বর্তমানে যে মুসলমান ও হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, মুসলমান ও নাস্তিকের মাঝে হারামভাবে বিবাহ-শাদী হচ্ছে, তা দ্বীনী ইল্ম বিবর্জিত ভ্রান্ত শিক্ষানীতিরই কুফল। কোন জাতির শিক্ষানীতি যদি ভ্রান্ত হয় এবং শিক্ষার নামে কুশিক্ষা চলতে থাকে, তাহলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই জাতিকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হোন এবং উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে অযৌক্তিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুন।

দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ আলেমগণ শুধু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ আর ওয়াজ-নসীহত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কেন? তারা কি জাতির জন্য কিছু খিদমত আঞ্জাম দিতে পারেন না? তারা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিল-ফ্যাক্টরীতে শ্রম দিতে পারতেন! তাতে জাতির অনেক উপকার হতো।

জওয়াব ঃ কিছু লোক কওমী মাদ্রাসায় পড়ে দ্বীনী লাইনে পারদর্শী হয়েছেন, আলেম হয়েছেন, তেমনি আরো কিছু লোক জেনারেল লাইনে পড়ে পারদর্শী হয়ে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। এখন কি কেউ প্রশ্ন তুলবে যে, ডাক্তাররা শুধু হাসপাতালে আর ক্লিনিকে কেন ব্যস্ত থাকেন? তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, মিল-কারখানায় শ্রম দিলে তো জাতির অনেক উপকার হতো! নিশ্চয় এ প্রশ্ন কেউ করবে না। কারণ, ডাক্তার এ কাজ শুরু করলে, জাতি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ঠিক তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম যদি মিল-ফ্যাক্টরী ও ব্যবসা-বানিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে জাতি বিনা হিদায়াতে ঈমানহারা হবে। তারা ইলমে দ্বীনের সেবা থেকে বঞ্চিত হলে, নিঃসন্দেহে বিপথগামী হয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হবে। জাতিকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই আলেম-উলামাগণ দ্বীনের জিম্মাদারী নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

তদুপরি আলেমগণ জাগতিক উন্নতির মাধ্যমও বটে। কারণ, একটি হাদীসে

www.nagorikpathagar.org

পাকের সার কথা হলো–"কিছু লোক যে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদেরকে উসীলা করে আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে প্রতিপালন করছেন।" অন্য এক হাদীসের সারমর্ম হল–"আলেম ও তালিবে ইলমের মাধ্যমে দ্বীন টিকে থাকার উপরই জগতের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।" বলা বাহুল্য–আলেম-উলামা ও তালিবে ইল্‌মদের দ্বীনী খিদমতের বদৌলতেই আল্লাহ্ তা'আলা যমীনে ফসল দিচ্ছেন, ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বরকত ও লাভ দিচ্ছেন, কল-কারখানায় উন্নতি দান করছেন। এক কথায়–চীন, রাশিয়া, জাপান, জার্মান, লন্ডন, আমেরিকাসহ সারা বিশ্ব টিকে আছে উলামায়ে কিরামের দ্বীনী খিদমতের উসীলায়। যেদিন এ দ্বীনী খিদমত বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন দুনিয়া আর টিকে থাকবে না। বরং সেদিন মহাপ্রলয় বা কিয়ামত সংঘটিত হয়ে সব ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

তাছাড়া আরো লক্ষ্য করুন! সংসদ সদস্যগণ মিল-ফ্যাক্টরীতে যোগদান করলে যেমন দেশ চলবে না, তেমনিভাবে উলামায়ে কিরাম জনগণের দ্বীনী খিদমত বাদ দিয়ে দুনিয়াবী কাজে লাগলে, দুনিয়াও অচল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা মুসলমান, কুরআন-হাদীস স্বীকার করেন, তাদের সম্বিত ফেরাবার জন্য আমরা এসব কথা পেশ করলাম। শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণকারী অবাধ্য নাস্তিক-মুরতাদদের সাথে আমাদের কোন তর্ক-বিতর্ক নেই।

তৃতীয় অভিযোগ ঃ আলিম সমাজ পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকা পছন্দ করেন কেন? তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা দুনিয়াবী অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলতে পারেন না?

জওয়াব ঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় পারদর্শী ও বড় বড় ডিগ্রিধারী লোকেরা অনেক শ্রম, সময় ও পয়সা ব্যয় করে বিভিন্ন লাইনে পারদর্শী হয়ে সেই লাইনে জাতির সেবা করছেন এবং জাতির নিকট থেকে তার বিনিময় গ্রহণ করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন। এটাই সমগ্র বিশ্বের একটা সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেকে তার লাইন অনুযায়ী জাতিকে সেবা করে বিনিময় গ্রহণ করবেন–এর মধ্যে দোষের কিছু নেই এবং এ জন্য যারা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে কেউ পরজীবী বলে না। তাহলে প্রশ্ন হলো, উলামায়ে কিরাম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী জনগণের দ্বীনী সেবা ও খিদমতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এর বিনিময় হিসেবে জনগণ থেকে হালালভাবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে, কেন তাদেরকে পরজীবী বলা হবে? কওম ও জাতির পক্ষ থেকে এটা কি আলেম সমাজের প্রতি দয়া বা করুণা? তারা কি জাতির

www.nagorikpathagar.org

কম গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিচ্ছেন? নাকি অল্পশ্রমে অধিক বিনিময় গ্রহণ করছেন? বরং আলেমগণ জাতির বিরাট খিদমত আনজাম দিচ্ছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের রাস্তা একমাত্র উলামায়ে কিরামই দেখাচ্ছেন। মানুষকে তাঁরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের যোগ্য হওয়ার পথ প্রদর্শন করছেন। তাছাড়া দুনিয়াতে এখনো লজ্জা-শরম বিবাহ্-শাদী, পাক-পবিত্রতা, আমানতদারী-সততা যতটুক বিদ্যমান আছে, তা একমাত্র উলামায়ে কিরামেরই অবদান। এর চেয়ে বড় খিদমত আর কি হতে পারে? এর তুলনায় অন্যদের যতরকম ক্ষণস্থায়ী ও নগণ্য খিদমতের কতটুকু মূল্য আছে? তাঁরা যথেষ্ট শ্রম দিয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ উপযোগী স্বল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ করছেন। উলামায়ে কিরাম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকদের তুলনায় অতি সামান্য বিনিময় নিয়ে থাকেন। তারপরও অযথা এ আপত্তি কেন?

আলেমগণের সম্পর্কে এধরণের অভিযোগ উত্থাপন জাতির জন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়। এর দ্বারা দ্বীনের কাজের গুরুত্বকে ছোট নজরে দেখা হয়–যা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে সহীহ্ ও সঠিক বিবেক-বুদ্ধি দান করুন।

ভ্রান্তি নিরসন–৩ ঃ অনেকে বলে থাকে যে, শুনেছি, হাদীসে আছে–আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'টি কিতাব বা দফতর আছে। তার একটির মধ্যে শুধু জান্নাতীদের নাম আছে, আর অপরটির মধ্যে আছে জাহান্নামীদের নাম এবং উভয় খাতার নামগুলো যোগ করে মোট সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে কোন হের-ফের বা বেশ-কম হবে না। তাহলে প্রশ্ন হয় যে, সব কিছু যদি আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কষ্ট করে আর আমল করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া আমল করেই বা লাভ কি? ফয়সালা তো আগেই হয়ে গেছে!

জওয়াব ঃ আপনি যে হাদীসটি শুনেছেন, তা সহীহ্ ও সঠিক। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাপারে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা উচিৎ নয়। কারণ, তাকদীরের ব্যাপারে নিজের আকল-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করা বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অথবা বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শরীআতে নিষেধ। একথা ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ইল্‌মের দ্বারা লিখে রেখেছেন যে, নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী আমল করে কোন বান্দাহ্ জান্নাতের বাসিন্দা হবে, আর কোন বান্দাহ্ হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। তবে তিনি এরূপ কেন লিখে রেখেছেন, তা তিনিই জানেন, এর মধ্যে অনেক

www.nagorikpathagar.org

হিকমত নিহিত রয়েছে। আমাদের শুধু এতটুকু জানতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? এর চেয়ে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। এ ব্যাপারে বান্দার জিম্মাদারী হলো, আল্লাহ্ তা'আলার এই ফয়সালার উপর ঈমান আনা এবং বাস্তবিক পক্ষে যে দু'টি কিতাব তৈরী আছে, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। এতটুকু করলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল। এর উপর ভিত্তি করে আমল না করা বা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব বহির্ভূত বা অনধিকার চর্চার শামিল।

সারকথা, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, উক্ত দুই কিতাবের উপর ঈমান রাখা এবং নিজের ইখতিয়ার দ্বারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ বাস্তবায়ন করা। কারণ, উক্ত কিতাবদ্বয়ে কি লেখা আছে, তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া সেই লেখা দ্বারা আমাদের ইখতিয়ার ও শক্তি তো নষ্ট হয়ে যায় নি! সুতরাং কিতাবে যা-ই লেখা থাকুক, আমাদের আমল করে যেতে হবে, এটাই বান্দার বন্দেগী ও তার দায়িত্ব। এরই মধ্যে তার সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। উক্ত হাদীস শুনে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)ও একই প্রশ্ন করেছিলেন, তার জওয়াবে নবী (সাঃ) তাঁদেরকে কিতাবের উপর ভরসা করে বসে না থেকে আমল করতে বলেছিলেন। কারণ, আমল বান্দার ইখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

উক্ত কিতাব দু'টি সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে—আশা করা যায় যে, এর দ্বারা বিষয়টি অনেকটা পরিস্কার হয়ে যাবে। যেমন, একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহের দরবারে বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ও যোগাযোগ আছে। কেউ বাদশাহকে দ্বীনী ব্যাপারের সহযোগিতা করতে আসেন এবং তার দ্বীনদারীর কারণে বাদশাহ তাকে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা করেন। আবার অনেকে নিজের হীন স্বার্থ আদায়ের জন্য বাদশাহের প্রতি বাহ্যতঃ মুহাব্বত প্রদর্শন করেন। এক সময় বাদশাহ্ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, নকল মুহাব্বতকারীরা দুর্নাম রটাবে যে, বাদশাহ্ মহোদয় আমাদের প্রতি ইনসাফ করলেন না। বাস্তবে আমরাও তাকে ভালবাসি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুরস্কার না দিয়ে অন্যদেরকে দিলেন। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য বাদশাহ্ একটা হিকমত অবলম্বন করলেন। বাদশাহ বললেন—১ম দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি পুরস্কৃত করবো। আর ২য় দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি শাস্তি প্রদান করব এবং উভয় দফতর চূড়ান্ত করে শেষে মোট সংখ্যা লেখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। বাদশাহের এ ঘোষণার পর প্রকৃত বাদশাহপ্রেমীগণ তাদের আচার-আচরণ ও দরবারে যাতায়াতের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করলেন না। তারা

www.nagorikpathagar.org

বললেন যে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই আল্লাহওয়ালা বাদশাহকে মুহাব্বত করছি এবং তার কাজে সহযোগিতা করছি। সুতরাং আমরা নেক কাজ করেই যাব। চাই বাদশাহ আমাদেরকে পুরস্কৃত করুন বা শাস্তি প্রদান করুন, এটা বাদশাহের নিজস্ব ব্যাপার। আর স্বার্থান্বেষী মহল বাদশাহের ঘোষণার পরে বাদশাহের দরবারে আসা-যাওয়া ও সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ দিল। তারা বলতে লাগলো যে, দু'টি দফতর যখন তৈরী হয়ে গেছে, তাহলে এখন দরবারে যাতায়াত বৃথা। কারণ, প্রথম দফতরে নাম থাকলে সর্বাবস্থায় পুরস্কার পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় দফতরে নাম থাকলে, শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সুতরাং দরবারে যাওয়া না যাওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই দরবারে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করাই ভালো। এর পরে নির্দিষ্ট তারিখে দেখা গেল যে, যারা দফতরের উপর ভরসা করে যাতায়াত বন্ধ করেছিল, তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। আর যারা দফতরের উপর নির্ভর না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে, তারা সকলেই তাদের খালেস মুহাব্বতের কারণে পুরস্কৃত হয়েছেন। এটা হলো উপরোক্ত বিষয়ের একটি উদাহরণ।

এর উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ তা'আলার দুই কিতাবের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা রূহের জগতে প্রথম যখন সকলকে জমা করেছিলেন, তখনই নিজের ইল্‌ম মুতাবিক এক দলকে জান্নাতে, আরেক দলকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন; কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির-মুশরিকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সুযোগ থাকতো যে, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমল করার সুযোগ দিলে আমরা অন্যদের থেকে বেশী আমল করতাম, কিন্তু আল্লাহ তো আমাদেরকে সুযোগই দিলেন না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম দ্বারা ফয়সালা না করে সকলকে আমলের সুযোগ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং উভয় দফতরের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন দুনিয়াতে যারা দফতরের উপর ঈমান তো রাখবে, কিন্তু দফতরের ভরসায় আমল পরিত্যাগ করবে না, হাশরের ময়দানে দেখা যাবে—শুধু তাদেরই নাম জান্নাতী দফতরে লেখা আছে। আর যারা দফতরের উপর নির্ভর করে আমল করেনি, দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুব বুদ্ধিমান হলেও আখেরাতের ব্যাপারে বড়ই অলস। অথচ যুক্তি-তর্কে খুব পারদর্শী। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে, এমন লোকগুলোর নাম জাহান্নামের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর এ কিতাবদ্বয়ের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং আমল করতে থাকতে হবে। তাহলেই পরকালে জান্নাত লাভে সক্ষম হওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

কুফর, শিরক ও গুনাহে কবীরা

শির্ক ও বিদ'আতের বর্ণনা

ঈমান অপেক্ষা মূল্যবান রত্ন ও আদরণীয় সামগ্রী জগতে আর নেই। মনে-প্রাণে এ অমূল্য রত্নের হিফাজত করা আবশ্যক এবং এ আদরণীয় সামগ্রীকে প্রাণের চেয়েও অধিক মহব্বত করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আকীদাগুলো হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ঈমানের ৭৭ শাখা হাসিল করলে, ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় হবে। আর কতগুলো জিনিস এমন আছে যে, তাতে ঈমান নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তার কিছু বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। এরই সংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, আখিরী যমানায় ঈমান রক্ষা করা কঠিন হবে। তথাপি সাবধান! জীবন দিয়ে হলেও প্রত্যেক মুমিনকে তার ঈমানের হিফাজত করতেই হবে। ঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "যারা সরল পথ (ইসলামের শিক্ষা) প্রকাশ পাওয়ার পর রাসূলের (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুসলমানের তরীকা ছাড়া অন্য তরীকা অবলম্বন করবে, আমি তাদেরকে সেই পথগামীই করব এবং পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। জাহান্নাম ভীষণ মন্দ জায়গা। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার পাপ কিছুতেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, তারা মহাপাপী। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে স্ত্রীজাতির অর্থাৎ দেবীদের এবং খোদার অভিশপ্ত সেই পাপিষ্ঠ শয়তানেরই পূজা করছে, যে মানব জাতির সৃষ্টির লগ্নে বলেছিল–'আমি মানবজাতির মধ্য হতে একদলকে নিজের অনুসারী বানিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে বিপথগামী করব, তাদেরকে নানা দুরাশায় আশ্বস্ত করব, আর তাদেরকে গৃহপালিত পশুর কান কাটতে আদেশ করব। তারা তা-ই করবে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে (অর্থাৎ শ্মশ্রুমুন্ডন বা দাড়ীমুন্ডন ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কাজ করতে) আদেশ করব, তারা তাই করবে'। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানের আদেশ পালন করবে, তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শয়তান তাদের নিকট ওয়াদা করে এবং আশ্বাসবাণী শুনায়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানের ওয়াদা ও আশ্বাসবাণী প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ১৫-২০)

শির্ক, বিদ'আত, জাহেলিয়্যাতের রসম ও শয়তানের পায়রবী যে কত জঘন্য অন্যায়, নিন্দনীয় এবং ঈমানের জন্য অনিষ্টকর, উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা তা স্পষ্টই বুঝা যায়। এসব কাজ করলে তাওহীদ ও রিসালতের আকীদা নষ্ট হয় এবং ঈমানের নূর ও রশ্মি চলে গিয়ে তথায় অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। তাই ঈমানের বিষয়াবলী ও ইসলামী আকায়িদ বর্ণনা করার পর সাধারণের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন বদ রসম ও বড় বড় গুনাহ্ (গুনাহ্ কাবীরা) বর্ণনা করে দেয়া সমীচীন মনে করছি। ঈমানদারগণ উক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে জেনে সেগুলো হতে বিরত থেকে নিজ নিজ ঈমানের হিফাজত করতে চেষ্টা করবেন বলে আশা করি।

প্রচলিত বদ রসমসমূহের মধ্যে কতগুলো তো একেবারে কুফর ও শিরক্ পর্যায়ের, আর কতগুলো কুফর ও শির্ক তো নয়; কিন্তু কুফর ও শিরকের কাছাকাছি, আর কতগুলো বিদ'আত ও গোমরাহী এবং কতগুলো হারাম, মাকরূহ ও গুনাহে কবীরা। সবগুলো থেকেই বেঁচে থাকা আবশ্যক। তবেই ঈমান গ্রহণীয় ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে।

শির্ক কাজসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলো শির্ক। এসব হতে দূরে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য ঃ

(১) কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এ রকম আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের সব অবস্থা জানেন।(২) জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুরদের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করা (৩) কোন পীর-বুযুর্গকে দূরদেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি তা শুনতে পেয়েছেন (৪) কোন পীর-বুযুর্গ, জ্বিন-পরী বা ভূত-ব্রাহ্মণকে লাভ-লোকসানের মালিক মনে করা। (৫) কোন পীর-বুযুর্গের কবরের নিকট আওলাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করা। (৬) পীর বা কবরকে

www.nagorikpathagar.org

সিজদা করা। (৭) কোন পীর-বুযুর্গের নামে শিরনী, সদকা বা মান্নত মানা। (৮) কোন পীর-বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা। (৯) আল্লাহ্‌র হুকুম ছেড়ে অন্য কারো আদেশ বা সামাজিক প্রথা পালন করা।(১০) কারো সামনে মাথা নীচু করে সালাম করা বা হাত বেঁধে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা। (১১) মুহাররমের সময় তা'যিয়া বানানো। (১২) কোন পীর-বুযুর্গের নামে জানোয়ার যব্হ করা বা কারো দোহাই দেয়া। (১৩) পীরের বাড়ীর বা কোন বুযুর্গের দরগাহ্ বা তীর্থকে, কা'বা শরীফের মত আদব বা তাযীম করা। (১৪) কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কারো নামে ছেলের নাক, কান ছিদ্র করা, আংটি পরান, চুল রাখা, টিকি রাখা ইত্যাদি। (১৫) আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ ইত্যাদি নাম রাখা। (১৬) কোন জিনিসের বা ব্যারাম-পীড়ার ছুত লাগে বলে বিশ্বাস করা। (১৭) মুহার্‌রম মাসে পান না খাওয়া, নিরামিষ খাওয়া, খিচুড়ী খাওয়া ইত্যাদি। (১৮) নক্ষত্রের তাছীর মানা বা তিথি পালন করা। (১৯) ভাল-মন্দ বার বা তারিখ জিজ্ঞাসা করা। যেমন, অনেকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই চাঁদে বিবাহ্ শুভ কি-না'? 'কোন্ দিন নতুন ঘরে যেতে হয়'? 'রবিবারে বাঁশ কাটা যায় কি-না?' ইত্যাদি। (২০) গণকের নিকট বা যার ঘাড়ে জ্বিন সওয়ার হয়েছে, তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট জিজ্ঞাসা করা। (২১) কোন জিনিস হতে কুলক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন, যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে অনেকে সেটাকে কুযাত্রা মনে করে থাকে। (২২) কোন দিকে যাত্রা করার সময় ঘরের দুয়ারে মা খাকি বলে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করা। (২৩) কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা। (২৪) কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপ করা। (২৫) এ রকম বলা যে, আল্লহ ও রাসূলের মর্জি থাকলে, এ কাজ হবে; বা খোদা-রাসূল যদি চান, তবে এ কাজ হবে। (২৬) এ রকম বলা যে, উপরে খোদা, নীচে আপনি। (২৭) কারো নামের কসম খাওয়া বা যিকর করা। কাউকে 'পরম পূজনীয়' সম্বোধন করে লেখা, 'কষ্ট না করলে, কেষ্ট পাওয়া যায় না বলা, 'জয়কালী নেগাহ্‌বান' ইত্যাদি বলা। (২৯) তেমাথা পথে ভেঁট দেয়া, পূজা উপলক্ষে কর্ম বন্ধ রাখা, দোল-পূজায় আবির মাখানো, বিষকরম পূজায় ছাতু খাওয়া, পৌষ মাস সংক্রান্তিতে গরু দৌড়ানো, ঘোড়া দৌড়ানো, আশ্বিন মাস সংক্রান্তিতে গাশ্চি, গোফাগুণে পূজা উপলক্ষে আমোদ উৎসব, নতুন কাপড় ক্রয়, পার্ব্বণী দেয়া, মনসা পূজা বা জন্মাষ্টমি উপলক্ষে নৌকা দৌড়ান। হিন্দুদের আড়ঙ্গে, মিছিলে, উৎসবে যাওয়া। (৩০) ছবি, ফটো বা মূর্তি রাখা, বিশেষ করে কোন বুযুর্গের ফটো তা'যীমের জন্য রাখা।

www.nagorikpathagar.org

বিদ'আতের বর্ণনা

নিম্নলিখিত কাজগুলো বিদ'আত। এগুলো থেকে দূরে থাকা কর্তব্য ঃ

(১) কোন বুযুর্গের মাযারে ধুমধামের সঙ্গে ওরস করা, মেলা বসানো, বাতি জ্বালানো। (২) মেয়েলোকের বিভিন্ন দরগায় যাওয়া। (৩) কবরের উপর চাদর, আগরবাতি, মোমবাতি ও ফুল দেয়া, (৪) কবর পাকা করা। (৫) কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য শরী'আতের সীমারেখার বেশী তা'যীম করা। (৬) কবরে চুমু খাওয়া। (৭) কবরে সিজদা করা। (৮) দ্বীনের বা দুনিয়ার কাজের ক্ষতি করে দরগায়-দরগায় বেড়ানো। (৯) কোন কোন অজ্ঞ লেখক আজমীর শরীফ, বাজেবোস্তান, পীরানে কার্লিয়ার ইত্যাদিকে মুসলমানদের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করেছে, তা দেখে তীর্থ গমনের ন্যায় সে সব স্থানে যাওয়া। (১০) উঁচু উঁচু কবর বানানো। (১১) কবর সাজানো, সেখানে ফুলের মালা দেয়া। (১২) কবরে গম্বুজ বানানো। (১৩) কবরে পাথর খোদাই করে কিছু লিখে লাগানো। (১৪) কবরে চাদর, শামিয়ানা ইত্যাদি টানানো। (১৫) মাযারে মিঠাই নযরানা দেয়া।

জাহিলিয়াতের রসমের বর্ণনা

নিম্নলিখিত কাজগুলো জাহিলী বদ রসম। এথেকে দূরে থাকা কর্তব্য ঃ

(১) ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন ও ইল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা না দিয়ে মূর্খ বানিয়ে রাখা বা কু-শিক্ষায়, কু-সংসর্গে লিপ্ত করে রাখা। (২) বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। (৩) বিবাহের সময় সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার-রসম পালন করা। (৪) বিবাহে নাচ-গান করানো। (৫) হিন্দুদের উৎসবে যোগদান করা। (৬) আস্‌সালামু আলাইকুম না বলে আদাব বা নমস্কার বলা। (৭) মুরব্বীকে আস্‌সালামু আলাইকুম বললে বে-আদবী মনে করা। (৮) মেয়েলোকদের দেবর, ভাশুর, মামাত, ফুফাত, খালাত, চাচাত ভাইদের বা ভগ্নীপতি, বৈয়াই, নন্দাই ইত্যাদির সঙ্গে হাসি-চাতুরি করা বা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিংবা পথে-ঘাটে বেড়ানো। (৯) গান–বাদ্য শুনা। (১০) জারি, যাত্রা, সংকীর্তণ, গাজীর গীত, থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেস্‌কোর্স ইত্যাদিতে যোগদান করা। (১১) সারঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন ইত্যাদি বাজানো বা শুনা। (১২) গান-গীত গাওয়া, বিশেষতঃ খাজাবাবার উরসের নামে গান করা বা শুনাকে ছওয়াবের কাজ মনে করা। (১৩) নসব বা বংশের গৌরব করা। (১৪) কোন বুযুর্গের বংশধর বা মুরীদ

www.nagorikpathagar.org

হলে, তিনিই পার করে দিবেন—এরূপ মনে করে নিজের আমল-আখলাক দুরুস্ত না করে বসে থাকা। (১৫) কারো জাত-বংশ বা নসবে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে, তা খুঁজে বের করা এবং তা নিয়ে খোটা দেয়া,গীবত করা। (১৬) ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করা। (১৭) কোন হালাল পেশাকে অপমানের বিষয় মনে করা। যেমন—দপ্তরীর কাজ করা, মাঝিগিরী বা দর্জিগিরী করা, মাছ বিক্রয় করা, তেল বা নুনের দোকান করা, মজুরী করে পয়সা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা ইত্যাদি পেশাকে খারাপ মনে করা। (১৮) আস্‌সালামু আলাইকুম বলাকে বে-আদবী মনে করা বা বললে উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করা। (১৯) চিঠিতে কাউকে পরমেশ্বর, পরম পূজনীয় লেখা। (২০) নামের আগে 'শ্রী' লেখা বা আল্লাহর নাম না লিখে, চিঠির উপরিভাগে 'হাবীব সহায়' লেখা। (২১) সাক্ষাতে কারো তা'রীফ করা বা শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন করে বড়লোকের প্রশংসা করা। (২২) বিবাহ-শাদীতে অযথা অপচয় ও অপব্যয় করা এবং হিন্দুদের রসম পালন করা; যেমন—ফুল, কুলা দ্বারা বৌবরণ করে নেয়া। (২৩) ঢাকুন পাড়িয়ে যাওয়া। (২৪) ভরা মজলিসে বৌ-এর মুখ দেখানো। (২৫) গীত গেয়ে স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হয়ে বর-কনেকে গোসল দেয়া। (২৬) পণ দাবী করা; (হ্যাঁ, মেয়ের বিবাহে বংশ অনুসারে মহর ধার্য করে তা শর্তানুযায়ী উসূল করা জায়িয, কিন্তু তা মেয়ের পাওনা, বাপ-ভাইয়ের নয়)। (২৭) বিবাহের সময় জোর-জবরদস্তি করে দাওয়াত গ্রহণ করা, বা দাওয়াত না দিলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। (২৮) মাতুলের টাকা বা খাতিরে টাকা লওয়া। (২৯) নওশাকে (দুলহাকে) শরী'আতের খেলাফ লেবাস-পোশাক পরানো। (৩০) পুরুষদের জন্য সোনার আংটি পরা বা পরানো। (৩১) পুরুষদের জন্য হাতে-পায়ে বা নখে মেহেন্দি লাগানো। (কিন্তু মেয়েলোকের জন্য মেহেন্দি লাগানো মুস্তাহাব।) (৩২) আতশবাজী করা। (৩৩) বিবাহে কাগজ কেটে বা কলাগাছ গেড়ে মাহ্‌ফিল সাজানো। (৩৪) মাহরাম-গাইরে মাহরাম ভেদাভেদ না করে মেয়েলোকদের মধ্যে জামাই বা অন্য লোক যাওয়া এবং মেয়েলোকদের গীত গাওয়া। (৩৫) কেউ মরে গেলে চিৎকার করে, মুখ-বুক পিটিয়ে বা মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করা। (৩৬) মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দূষণীয় বা খারাপ মনে করা। (৩৭) বেশী সাজসজ্জা, ফ্যাশন বা বাবুগিরিতে লিপ্ত হওয়া। (৩৮) সাদাসিধা বেশ-ভূষাকে ঘৃণা করা, লম্বা ঢিলা পিরহান, টাখনুর উপরে পায়জামা পরা ও টুপি

www.nagorikpathagar.org

পরাকে অবজ্ঞা করা, বিশেষতঃ এসব দেখে উপহাস করা। (৩৯) তসবীর ও ছবি লটকিয়ে ঘরের বা কামরার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। (৪০) পুরুষের রেশমী লিবাস পরা, সোনার আংটি, সোনার চেইন, সোনার ঘড়ি বা সোনার ফ্রেমের চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা। (৪১) পাতলা কাপড়, ধুতি, হাফপ্যান্ট, প্যান্ট বা হ্যাট কোট পরা। (৪২) বাজনাওয়ালা জেওর মেয়েদের ব্যবহার করা। (৪৩) কাফিরদের অর্থাৎ হিন্দু বা ইংরেজদের বেশ-ভূষা, ফ্যাশন অবলম্বন করা। (৪৪) হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে বা কোন পীরের দরগায় যে মেলা বসে, তাতে যোগদান করা। (৪৫) বেটা ছেলেদের জেওর পরানো। (৪৬) দাড়ি কামানো, ছাটানো বা উপড়ানো। (৪৭) মোচ বাড়ান, এলফেট রাখা। (৪৮) টাখনুর নীচ পর্যন্ত পায়জামা বা লুঙ্গি পরা। (৪৯) পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের বা স্ত্রী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করা। (৫০) শুধু সৌন্দর্যের জন্য বা ফ্যাশনের জন্য কামরার ছাদে বা দেয়ালে চান্দোয়া লটকিয়ে রাখা। (৫১) কাল খেযাব লাগানো। (৫২) কোন জীবকে বা জিনিসকে অশুভ মনে করা। যেমন, পেঁচা ঘরে ঢুকলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে, বাট্‌খারায় পা লাগলে কারবারে বরকত থাকবে না, তিল হাড়ি মাটিতে স্পর্শ করলে তিলে বিছা লাগবে, ধান বুনে খৈ ভাজলে ধান জ্বলে যাবে, জাল ডিঙ্গালে জালে মাছ পড়বে না ইত্যাদি অলীক ধারণা পোষণ করা। (৫৩) হিন্দু শাস্ত্র মতে একটি রাত এমন শর্তানুযায়ী উসূল করা জায়িয রয়েছে, যাতে চুরি করলে পাপ নেই, সেই রাত্রে মুসলমানদের সেরূপ করা। (৫৪) শরীরে সুঁচের দ্বারা খোদাই করে ব্যাঘ্র বা নিজ মূর্তি কিংবা অন্য কোন ছবি অঙ্কন করা। (৫৫) পাকা চুল বা দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা। (৫৬) শাহওয়াতের সাথে কারো সঙ্গে কোলাকোলি–গলাগলি করা বা হাত মিলানো। (৫৭) শতরঞ্জ, তাস, পাশা, কড়ি ইত্যাদি খেলায় লিপ্ত হওয়া। (৫৮) টিভি, সিনেমা, বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখা। (৫৯) যাত্রা, জারি, মারফতী ইত্যাদি গান শুনা। (৬০) সার্কাস দেখা। (৬১) খরিদদারের সঙ্গে ধোকাবাজি করা বা মাল দেখে সে মাল ক্রয় না করলে, তাকে মন্দ বলা। (৬২) শরী'আতের খেলাফ ঝাড়-ফুঁক বা তাবীয-তুমার করা। (৬৩) অনুমান করে শরী'আতের মাসআলা বাতানো। (৬৪) হিন্দুদের নিকট থেকে তা'বীয বা পানি-সূতা পড়িয়ে নেয়া। (৬৫) দোকান শুরু করতে, নৌকা খুলতে বা জাল ফেলতে নেবা দেয়া বা নৌকার গলুয়ে পানির ছিটা দেয়া ইত্যাদি।

মূর্খতা বশতঃ সমাজে এরূপ আরও অনেক কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে সবও পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

কবীরা গুনাহ্‌র বর্ণনা

কবীরা গুনাহ্ করলে ঈমান অত্যন্ত কমজোর হয়ে পড়ে এবং অনেক দিনের ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা অর্জিত নূর নষ্ট হয়ে যায়। আর এর ভয়াবহতা এমন যে, একটি গুনাহে কবীরাই মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। তওবাহ্ ছাড়া গুনাহে কবীরা মাফ হয় না। কবীরা গুনাহ্কে জায়িয বা হালাল মনে করলে, ঈমান চলে যায়।

এখানে কতগুলো কবীরা গুনাহ্‌র তালিকা দেয়া হল। প্রত্যেকেরই এসব গুনাহ হতে বেঁচে নিজ নিজ ঈমানের হিফাজত করা অবশ্য কর্তব্য ঃ

(১) শির্‌ক করা। (২) মা-বাপকে কষ্ট দেয়া। (৩) যিনা করা। (৪) ইয়াতীমের মাল খাওয়া। (৫) জুয়া খেলা। (৬) বিনা প্রমাণে কারো উপর তুহ্মত লাগানো। (৭) জিহাদ হতে (অর্থাৎ, কাফিরদের সাথে যে ধর্মযুদ্ধ হয়, তা থেকে) পলায়ন করা। (৮) মদ (শরাব) পান করা। (৯) কোন লোকের উপর অত্যাচার করা। (১০) গীবত করা অর্থাৎ অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা। (১১) কারো প্রতি বদগোমানী করা অর্থাৎ অনর্থক কাউকে মন্দ মনে করা। (১২) নিজেকে ভাল মনে করা। (১৩) অন্তরে খোদার ভয় না রাখা বা খোদার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া। (১৪) ওয়াদা করে তা পূরণ না করা। (১৫) পাড়া-প্রতিবেশীর ঝি-বৌকে কু-নজরে দেখা। (১৬) আমানতের খিয়ানত করা। (১৭) ফরজ কাজ না করা, যেমন নামায না পড়া, রামাযানের রোযা না রাখা, যাকাত না দেয়া, হজ্জ্ না করা ইত্যাদি। (১৮) কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। (১৯) সত্য সাক্ষ্য গোপন করা। (২০) মিথ্যা কথা বলা। (২১) মিথ্যা কসম খাওয়া। (২২) কারো জানের, মালের বা ইজ্জতের হানি করা। (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা। (২৪) জুমু'আর নামায না পড়া। (২৫) ওয়াক্তিয়া নামায না পড়া। (২৬) কোন মুসলমানকে কাফির বলা। (২৭) কারো গীবত করা বা শুনা। (২৮) চুরি করা। (২৯) জালিম-অত্যাচারীদের প্রশংসা বা তোষামোদ করা। (৩০) সূদ বা ঘুষ খাওয়া। (৩১) অন্যায়-বিচার করা। (৩২) কোন জিনিস মেপে দিতে কম দেয়া এবং নেয়ার সময় বেশী নেয়া। (৩৩) দাম ঠিক করে পরে জোর-জবরদস্তি কম দেয়া। (৩৪) বালকদের সঙ্গে কু-কর্ম করা। (৩৫) হায়িয ও নিফাস অবস্থায় বা মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা। (৩৬) ধান-চাউলের অধিক দর দেখে খুশী হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

(৩৭) বেগানা স্ত্রীলোককে দেখা বা তার সাথে কথাবার্তা বলা বা তার নিকটে একা একা বসা। তেমনিভাবে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষকে দেখা বা তার সঙ্গে বেপর্দা কথা বলা বা দেখা দেয়া। (৩৮) গরু-বাছুরের সাথে কু-কর্ম করা। (৩৯) কাফিরদের রীতি-নীতি পছন্দ করা। (৪০) গণকের কথা ঠিক মনে করা (৪১) নিজেকে বড় মুসল্লী ও বড় পরহেযগার বলে দাবী করা। (৪২) প্রিয়জনের বিয়োগে সিনা পিটিয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন করা। (৪৩) খাওয়ার জিনিসকে মন্দ বলা। (৪৪) নাচ দেখা। (৪৫) লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা। (৪৬) গান-বাদ্য শুনা। (৪৭) অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা। (৪৮) অবৈধ কাজ করতে দেখে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নসীহত না করা। (৪৯) হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা। (৫০) কারো দোষ অন্বেষণ করা। (৫১) জমিনের আইল বা লাইন ভেঙ্গে সীমানা পরিবর্তন করা। (৫২) মানুষ খুন করা। (৫৩) কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা। (৫৪) ভিডিও, টিভি, ভিসিআর ক্রয় এবং তা ঘরে রাখা ও দেখা। (৫৫) সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা বা সিনেমা দেখা। (৫৬) নাট্য ও নৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা দেখা। (৫৭) সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (৫৮) পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করা বা তার সহযোগিতা করা। (৫৯) প্রমোদবালার পেশা গ্রহণ করা। (৬০) খাজা বাবা বা জারী গানের আসর বসানো বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (৬১) সাবালকদের হাফপ্যান্ট পরে চলা ফেরা বা খেলা ধুলা করা। (৬২) গান ও নৃত্য শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া। (৬৩) বীমা, ইন্সুরেন্সে অংশ গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত সকল প্রকার বীমা ও ইন্সুরেন্স সূদ ও জুয়ার মধ্যে শামিল। (৬৪) দাবা খেলা। (৬৫) শরী'আত বিবর্জিত শেয়ার ব্যবসা করা। (৬৫) লটারীর টিকেট ক্রয়-বিক্রয় ও তার পুরস্কার গ্রহণ করা। (৬৭) মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরী করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা। (৬৮) স্মৃতি হিসেবে অগ্নি শিখা জ্বালিয়ে রাখা, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, বা বিজাতীয় প্রথা পালন করা। (৬৯) জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা, ভবিষ্যতের খবর বলা বা তাদের কাছে এসব জিজ্ঞাসা করা। (৭০) মন্দিরে, ওরসে, বা কোন শিরক-বিদ'আতের কাজে আর্থিক সাহায্য করা। (৭১) নাইট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (৭২) যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা বা সেখানে বেপর্দা হয়ে পড়াশুনা করা। (৭৩) মডেলিং করা।

www.nagorikpathagar.org

কতিপয় কবীরা গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

"তোমরা যদি নিষিদ্ধ বড় বড় পাপগুলো হতে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলোকে আমি মাফ করে দিব।"(সূরাহ্ নিসা ঃ ৩১)

এ আয়াত দৃষ্টে এখানে কতিপয় গুনাহে কবীরার সবিস্তর আলোচনার আশা করছি, যাতে সেসব বিস্তারিতভাবে জেনে সেই সকল পাপ কাজ হতে আত্মরক্ষা করা সহজ হয় ঃ

১। শিরক; এটা সর্বাপেক্ষা মহাপাপ। এর বিপরীত তাওহীদ। দুনিয়ার জীবনেই তওবা করে তাওহীদ গ্রহণ না করে এই পাপের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে, শিরক পাপের শাস্তি স্থায়ী জাহান্নাম হতে বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই।

২। 'উকুকুল ওয়ালিদাঈন' অর্থাৎ মা-বাপের নাফরমানী করে মা-বাপের মনে কষ্ট দেয়া, এটা অন্যতম কবীরা গুনাহ্। এর বিপরীত 'বিররুল ওয়ালিদাঈন' অর্থাৎ মা-বাপের খিদমত করা অনেক বড় নেকী।

৩। 'কাত্য়ে রেহেম' অর্থাৎ এক মায়ের পেটের ভাই-বোনদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা। মায়ের পেটের বলতে দাদীর পেটের চাচা, ফুফু, নানীর পেটের মামা, খালা এবং ভাই-বোনের ছেলে-মেয়ে ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগ্নে, ভাগ্নী সবাইকেই বুঝায়; অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। যে যত বেশী নিকটবর্তী, তার হক তত বেশী। কাতয়ে রেহেমী কবীরা গুনাহ। এর বিপরীত"সিলাহ্ রেহেমী বা আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।"

৪। 'যিনা' অর্থাৎ নারীর সতীত্ব নষ্ট করা, পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা, ব্যাভিচার করা; এটা অত্যন্ত জঘন্য কবীরা গুনাহ্। এর বিপরীত নারীর সতীত্ব রক্ষা করা ও পুরুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখা ফরজ। নারীর সতীত্ব ও পুরুষের চরিত্র পবিত্র রাখার জন্যই আল্লাহ তা'আলা কুর'আন শরীফের মধ্যে পর্দা বিধান প্রদান করেছেন এবং বেপর্দার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। নারী জাতির জন্য পর্দা অবলম্বন ফরজ এবং উত্তেজনা বর্ধনকারী, যৌন আবেদনকারী যাবতীয় জিনিষ যেমন, অশ্লীল ছবি, নাটক, থিয়েটার, সিনেমা, বায়োস্কোপ, টিভি, ভি.সি.আর ইত্যাদি দেখাকে হারাম।

www.nagorikpathagar.org

তদ্রূপ বালকদের সঙ্গে কু-কর্ম করা যিনার চেয়েও বড় পাপ এবং এর শাস্তিও ভয়ানক। বিবাহিত অবস্থায় যিনা করলে এবং তা স্বীকার করলে অথবা চারজন সত্যবাদী সাক্ষীর দ্বারা তা প্রমাণিত হলে, ইসলামী হুকুমতে তার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর মেরে প্রাণে বধ করে ফেলা। আর অবিবাহিত অবস্থায় যিনা প্রমাণিত, হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। আর বালকের সঙ্গে কুকর্মকারীর শাস্তি হচ্ছে–তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া।

হযরত ঈসা (আঃ) একদিন ভ্রমণকালে দেখতে পেলেন–একটি কবরের মধ্যে একজন মানুষ আগুন দ্বারা জ্বালানো হচ্ছে। তিনি আল্লাহর নিকট এর ভেদ জানতে চাইলে আল্লাহর নির্দেশে সেই লোকটি বলল, এই আগুন সেই বালকটি–যাকে আমি খুব ভালবাসতাম। তারপর ক্রমান্বয়ে আমি বালকটির সঙ্গে কুকর্ম করে বসলাম। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে এরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫। "চুরি করা" কবীরা গুনাহ্। সাধারণ চুরির চেয়ে বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস ঘাতকতা করে চুরি করা অর্থাৎ আমানতের খিয়ানত করা অনেক বেশী পাপ।

৬। অন্যায়ভাবে যে কোন "মানুষ খুন করা" কবীরা গুনাহ্। ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী সংখ্যালঘুকে খুন করা, তার মাল চুরি করা ও তার নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং কোন মুসলমানকে খুন করা, তার মাল চুরি করা ও তার নারীর সতীত্ব হরণ করা এক সমান পাপ এবং এক সমান শাস্তি।

তিন কারণ ব্যতীত কোন মানুষের জীবনকে বধ করা যায় না, যথা ঃ (ক) মানুষ খুন করলে। (খ) বিবাহিত অবস্থায় অন্য নারীর সতীত্ব হরণ করলে। (গ) মুরতাদ হয়ে গেলে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে। অবশ্য এ শাস্তি জারী করার অধিকার একমাত্র ইসলামী হুকুমতের প্রশাসকদের।

৭। "মিথ্যা তুহ্মত লাগানো" এটাও কবীরা গুনাহ্। সবচেয়ে বড় তুহ্মত হচ্ছে যিনার তুহ্মত। কারো উপর যিনার তুহ্মত দিলে আখিরাতে তার দোযখের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ার শাস্তি এই যে, তাকে আশি দোররা মারতে হবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তুহ্মত ও অশ্লীল গালীর শাস্তি বিচারক ও সমাজ নেতার বিচার অনুসারে কম-বেশী হবে। শাস্তির দ্বারা সমাজ পবিত্র হয়।

৮। "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া" এটা অত্যন্ত মারাত্মক কবীরা গুনাহ্। এরও শাস্তি বিধান করা রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্তব্য। মিথ্যা বলা মহাপাপ। এই পাপের প্রতি সমাজের ঘৃণা থাকা দরকার। শৈশবে শিশুরা যাতে মিথ্যায় অভ্যস্ত না হয়, সেদিকে

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবকের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

৯। "যাদু করে কারো ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা" কবীরা গুনাহ্। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক, শয়তান জ্বিনের সাধনা করে মাছ, গোশ্ত পরিত্যাগ করে পাক-ছাফ ও ফরজ গোছল পরিত্যাগ করে, কালীর সাধনা করে, যাদু বিদ্যা হাসিল করে, মূর্খ সমাজে পীর বা ফকির নামে পরিচিত হয়ে গোপনে গোপনে কারো মাথার চুল কেটে নিয়ে, কারো কাপড়ের কোনা কেটে, কারো ঘরের দুয়ারে শশ্মানের কয়লা, শশ্মানের হাড়ের তাবিয পুঁতে, কাউকে বান মেরে মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে; একেই যাদু বলে। শরী'আত অনুসারে এটা অত্যন্ত জঘন্য পাপ কাজ। এরূপ ব্যক্তিকে ধরতে পারলে তার শাস্তি বিধান করা সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আখিরাতের শাস্তি তো পরে হবে, দুনিয়ার শাস্তি এখানেই হওয়া দরকার। বিনা সাক্ষীতে, বিনা প্রমাণে কারো উপর কোনরূপ (চুরি ইত্যাদির) দোষারোপ করা এই ভিত্তিতে যে, সূরাহ্ ইয়াসীন পড়ে লোটা ঘুরানোতে বা বাটী চালান, চটা চালান, খুর চালান দেয়াতে অমুকের নাম উঠেছে, এটাও এক প্রকার যাদুর অন্তর্গত। ইসলাম এরূপ নীতিহীন-ভিত্তিহীন দোষারোপকে কিছুতেই অনুমোদন করে না।

১০। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে বিনা উজরে তা ঠিক না রাখা, এগুলোও মারাত্মক কবীরা গুনাহ্।

১১। আমানতের খিয়ানত করা কবীরা গুনাহ্। আমানত অনেক রকমের আছে। টাকা-পয়সা, বিষয় সম্পত্তির আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি।

১২। গীবত করা, তথা কারো অসাক্ষাতে তার বদনামী ও নিন্দা করা (যদিও তা সত্য হয়) কবীরা গুনাহ্।

১৩। বিদ্রোহী বানানো অর্থাৎ স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনিবের বিরুদ্ধে চাকরকে, উস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরিদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে খেপিয়ে তোলাও কবীরা গুনাহ্। হাদীস শরীফে আছে ঃ "কোন চাকরকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যে উস্কানি দেয়, সে আমাদের মুসলমানদের দলভূক্ত নয়।"

১৪। নেশা যুক্ত জিনিস পান করা কবীরা গুনাহ্। যেমন, মদ, গাঁজা, হিরোইন ইত্যাদি। নেশার দ্বারা উদ্দেশ্য–যা পান করলে ব্রেনের স্বাভাবিক কর্ম ব্যাহত হয়।

১৫। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা। মদের দ্বারা যেমন নেশা হয়, মদ্যপানে যেমন

www.nagorikpathagar.org

মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যায়, তার চেয়েও মানুষের মধ্যে বড় নেশা হল যৌন উত্তেজনার নেশা এবং যৌন উত্তেজনা হলে মানুষ বুদ্ধি হারিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। পুরুষ জাতির এই যৌন ক্ষুধাকে যারা উত্তেজিত করে, অর্থাৎ নারী জাতি যখন যুবক পুরুষদের সামনে তাদের রূপ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়ায়, মেকি রূপ, অঙ্গভঙ্গি করে বা নেচে নেচে দেখায় বা নগ্নমূর্তি, উলঙ্গ ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা হয় (যেমন, টি.ভি, ভি.সি.আর ও সিনেমায় অশ্লীল ছবি দেখানো হয়), তখন যুবকদের যৌন ক্ষুধা উত্তেজিত হয়ে তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করে বসে এবং তাদের স্বাস্থ্য, সম্পত্তি, সময় ও স্বচ্ছ মনের এবং সুস্থ বিবেকের ভীষণ ক্ষতি হয়। এ জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা যিনার কাছেও যেও না" (সূরাহ্ বনী ইসরাঈল ঃ ৩২) অর্থাৎ যে কাজে যিনার উপক্রম হতে পারে, বা যৌন চাহিদার সৃষ্টি হতে পারে, সে কাজ করো না। এই ক্ষতি যাদের দ্বারা হয়, তারাও মহাপাপী।

১৬। 'জুয়া খেলা' ও 'লটারী ধরা' এটাও কবীরা গুনাহ্। এর নেশাও মদের নেশা ও কামিনী-কাঞ্চনের নেশা অপেক্ষা কম নয়। জুয়া খেলা অনেক রকমের আছে। ঘোড় দৌড়, কুকুর দৌড়, পাশা খেলা, তাস খেলা, সতরঞ্জ খেলা, বা টিকেট ধরা –এ সবই জুয়া, অর্থাৎ যাতে বাজি ধরা আছে, তা-ই জুয়া। জুয়া খেলা মহাপাপ। সমাজে ও রাষ্ট্রে এর প্রসার বন্ধ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার।

১৭। 'সূদ' খাওয়া কবীরা গুনাহ। সূদ অনেক প্রকারের আছে, যেমন–সরল সূদ, চক্রবৃদ্ধি সূদ, ব্যাঙ্কের সূদ, বীমা ইন্সুরেন্সের সূদ ইত্যাদি। সর্ব প্রকারের সূদই মহাপাপ। প্রচলিত সকল প্রকার বীমা ইন্সুরেন্স সূদ বা জুয়ার মধ্যে শামিল। দুর্ঘটনার সময় যে বড় অংক পাওয়া যায়–তা জুয়ার মধ্যে শমিল। আর স্বাভাবিকভাবে যে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়, তাও সূদের মধ্যে শামিল। সুতরাং বীমা ও ইন্সুরেন্স থেকে পরহেয করা ফরজ। সরকারী আইনের কারণে কেউ অপারগ হলে, সে অবস্থার হুকুম কোন মুফ্তীর নিকট থেকে জেনে নিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "আল্লাহর অটল বিধান, সূদের দ্বারা আসে ধ্বংস, আর যাকাত, খয়রাত ও দানের দ্বারা আসে বরকত।" (সূরাহ্ বাকারাঃ ২৭৬)

সূদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে। কাজেই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, সূদ না হলে ব্যাংক কিভাবে চলবে? আর ব্যাংক না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যই বা চলবে কিভাবে? সূদ খাওয়া আর দেয়া উভয়ই গুনাহে কবীরা। তবে সূদ খাওয়া সর্বাবস্থায়ই

www.nagorikpathagar.org

মহাপাপ। কিন্তু জান-মালের হেফাজতের জন্য অপারগ হয়ে সূদ দেয়া মহাপাপের অন্তর্ভূক্ত নয়।

১৮। 'রিশ্ওয়াত' অর্থাৎ ঘুষ খাওয়া কবীরা গুনাহ। ঘুষের মাধ্যমে অবৈধভাবে কার্য উদ্ধার করা মহাপাপ।

যাদের সরকারী বেতন ধার্য আছে, তারা কর্তব্য কাজে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করবে, সবই ঘুষ বলে বিবেচিত হবে। চাই একটা সিগারেট হোক বা এক কাপ চা কিংবা এক খিলি পান অথবা একটা ডাবই হোক এবং যদিও দাতা খুশী হয়ে দেয়।

আর যাদের কোন বেতন ধার্য নেই, তারা যদি চুক্তির মাধ্যমে মজুরী নির্ধারণ করে কোন কাজ করে এবং মজুরী গ্রহণ করে, তা ঘুষ নয়। যারা সরকারের বেতনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, তাদের কোন মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মান অথবা ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যদি তাদের জন্য কোন উপঢৌকন দেয়া হয়, তবে সেটা ঘুষ নয়। বরং এরূপ উপঢৌকনকে বলা হয় হাদিয়া। কিন্তু এরূপ দানের মধ্যে দাতার পক্ষে কোনরূপ কার্যোদ্ধারের নিয়ত বা গ্রহীতার পক্ষে কোনরূপ লোভের আশা থাকলে, তা আর হাদিয়া থাকবে না, বরং সেটাও এক প্রকার রিশ্ওয়াতেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। শুধু সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ করা, সত্য সাক্ষ্যদানের বিনিময় গ্রহণ করা, ন্যায়-বিচারের বিনিময় গ্রহণ করা, মৌখিকভাবে মাসআলা বলে, কুরআন পাঠ করে সওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করা, তারাবীহ নামাযে কুরআন শুনিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা, মুরীদ করে, দ্বীনের সবক বলে দিয়ে, নসীহত করে বিনিময় গ্রহণ করা—এসবও রিশ্ওয়াতের পর্যায়ভূক্ত। অবশ্য ন্যায় বিচার করার জন্য, দ্বীনী সবক শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং নসীহত দ্বারা চরিত্র গঠন করার জন্য লোক নিযুক্ত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষ হতে তাদের জন্য কিছু ভাতা নির্ধারণ করে দিলে, তা হারাম বা রিশ্ওয়াত হবে না।

১৯। জোর-যুলুম করে অর্থ বা অতর্কিতভাবে কোন মুসলমান বা কোন সংখ্যালঘুর ছোট কিংবা বড় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হরণ করা বা ভোগ দখল করা কবীরা গুনাহ।

২০। অনাথ এতীমের মাল বা নিরাশ্রয় বিধবার মাল খাওয়া কবীরা গুনাহ। এতীম-বিধবার মাল খাওয়া যেমন মহাপাপ, তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে বিধবার খিদমত করা মহাপূণ্যের কাজ।

২১। 'খোদার ঘর যিয়ারতকারী' তথা হজ্জ যাত্রীদের সহিত দুর্ব্যবহার করা কবীরা গুনাহ্।

www.nagorikpathagar.org

২২। মিথ্যা কসম খাওয়া কবীরা গুনাহ্।

২৩। কোন মুসলমানকে গালি দেয়া, মুসলমানে মুসলমানে গালাগালি করা কবীরা গুনাহ্। কারণ, মিথ্যা তুহ্মত ও অশ্লীল কথা বার্তা প্রয়োগ–এই দু'টি পাপের দ্বারা "গালি" তৈরি হয়। হাদীসে আছে ঃ "কোন মুসলমানকে যে গালি দিবে, সে ফাসিক হয়ে যাবে।"

২৪। জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ্। জিহাদের আসল অর্থ–আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এমনকি যদি দ্বীনের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতেও হয়, তাতেও কুণ্ঠা বোধ না করা। দ্বীনের দুশমনরা সত্য ধর্মকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্য অনেক দূর থেকে অনেক সূক্ষ্ম কুটনৈতিক চেষ্টা তদবীর করে, সেগুলো উদ্ধার করে সে সবের প্রতিকার করা জিহাদের পর্যায়ভূক্ত। আর যে জামানায় বৈধ যে উপায়ে দ্বীন জারী করা যায় এবং দ্বীনের দুশমনদেরকে দুর্বল করা যায়, সে জামানায় সেই কাজই জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। সেরূপ দ্বীনের খিদমত হতেও পলায়ন করা জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করার শামিল ও সমতুল্য গুনাহ্র কাজ।

২৫। 'ধোকা দেয়া', বিশেষতঃ শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা কর্তৃক জনসাধারণকে ধোকা দেয়া মারাত্মক কবীরা গুনাহ্। কারবারের মধ্যে, বেচা-কেনার মধ্যে ধোকা দেয়াও মহাপাপ। কিন্তু শাসক বা বিচারক হয়ে ধোকা দেয়ার তুলনা নেই।

২৬। 'অহঙ্কার করা' কবীরা গুনাহ্। পদের অহমিকা বা ধন-সম্পদের গৌরবে গরীবদেরকে তুচ্ছ মনে করা বা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করায় অন্য কোন বংশীয় লোকদেরকে হেকারত করা যেমন, যারা কাপড় বুনায়, তাদেরকে জোলা বলে তুচ্ছ করা, যারা তেল উৎপাদন করে, তাদেরকে 'তেলি' বলে তুচ্ছ করা, যারা কৃষি কাজ করে, তাদেরকে চাষা বলে হেকারত করা, যারা আরবীতে ধর্ম বিদ্যা চর্চা করে, তাদেরকে মোল্লা বলে তুচ্ছ করা ইত্যাদি অহঙ্কার-তাকাব্বুর ও কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের অন্তর্ভূক্ত।

২৭। 'বাদ্য-বাজনাসহ নাচ-গান করা' কবীরা গুনাহ্। হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "বর্বরতার যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যেমন, বাঁশী, বাদ্য ইত্যাদি"।

২৮। 'ডাকাতি করা, লুণ্ঠন করা' কবীরা গুনাহ্। প্রত্যেক মুসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রত্যেক অমুসলমান নাগরিকের জান-মাল ও ইজ্জত পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

আমানত। এ আইন ভঙ্গ করা, কারো জান-মাল বা ইজ্জত হরণ করা কবীরা গুনাহ্।

২৯। 'স্বামীর নাফরমানী করা' কবীরা গুনাহ্। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "তিন প্রকার লোকের ইবাদত-বন্দেগী যেমন, নামায-রোযা ইত্যাদি কবুল হয় না ঃ (ক) ক্রীতদাস, যদি তার প্রভুর নিকট হতে পলায়ন করে। (খ) স্ত্রী, যদি স্বামীকে নারায রাখে। (গ) মদখোর, যে নেশা পান করে।" একজন মেয়েলোক স্বামীর হক্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে নবী (সাঃ) বলেন ঃ "খবরদার! সাবধান থাক, সব সময় লক্ষ্য রেখো–স্বামীর মনের মধ্যে তুমি আছ কি-না? জেনে রাখ, পতিই সতীর গতি। স্বামীই স্ত্রীর বেহেশত অথবা দোযখ।"

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হে কন্যা সকল! তোমরা নারী জাতি। যদি তোমরা তোমাদের স্বামীর হক জানতে, তবে প্রত্যেক নারী তার স্বামীর পায়ের ধুলা-কাদা মুখের দ্বারা ছাফ করতে।"

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর আইনে যদি কারো জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা জায়িয হত, তবে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। স্বামীর হক্ব স্ত্রীর উপর এত বেশী। প্রত্যেক স্ত্রীর উপর ওয়াজিব–হায়া-শরম সহকারে স্বামীর সামনে চক্ষু নীচু করে রাখা এবং স্বামীর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করা এবং স্বামী যখন কথা বলেন, তখন চুপ করে থাকা। যখনই স্বামী বাড়ী আসেন, তখনই তার কাছে এসে তার প্রতি সম্মান করা এবং যে সমস্ত কাজে স্বামী অসন্তুষ্ট হন, সেই সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকা। আর যখন স্বামী বাইরে যান, তখন তার যাবতীয় নির্দেশ মুতাবিক কাজ সমাধা করা। স্বামী যখন শয়ন করেন, তখন নিজেকে তার সামনে পেশ করা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ, তার সন্তান-সন্ততি ও স্বীয় ইজ্জত-আবরুর হিফাজত করা; আদৌ কোনরূপ খিয়ানত না করা। সুগন্ধি ব্যবহার করে স্বামীর সামনে আসা এবং মুখ, শরীর, কাপড় যেন কোনরূপ দুর্গন্ধযুক্ত না হতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, স্বামীর উপস্থিতিতে সাজ-সজ্জা করা ও তার অনুপস্থিতিতে সাজ-সজ্জা না করা, স্বামীর ভাই-বোনদের ভালবাসা, তাদেরকে আদর যত্ন ও ইজ্জত সম্মান করা। স্বামী যা কিছু এনে দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, শোক্র করা। স্বামীর বাড়ীর বাইরে না যাওয়া। যদি প্রয়োজন বশতঃ কোথাও যেতে হয়, তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাওয়া এবং ময়লা কাপড় পরিধান করে ও ময়লাযুক্ত বোরকা পরিধান করে যাওয়া। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–"যে মেয়েলোক তার

www.nagorikpathagar.org

স্বামীর বাড়ী হতে স্বামীর বিনা ইজাযতে বাইরে যায়, তার উপর ফেরেশ্তাগণ লা'নত করতে থাকেন।"

ইসলাম ধর্মের ও মানব কল্যাণের অনেক শত্রু আছে। তারা বলে থাকে যে, পুরুষরা নারীদেরে পরাধীন করে রেখেছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই স্ত্রীকে স্বামীর তাবেদারী করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ "পুরুষরা নারীদের অভিভাবক।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ৩৪)

ইসলাম যেমন নারীদেরকে স্বামীর পূর্ণ তাবেদারী করার হুকুম করেছে, তদ্রূপ স্বামীদেরকেও নির্দেশ দিয়েছে নিজ স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। দুর্ব্যবহার বা জুলুম করতে অতি কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দিতে এবং যথাসম্ভব তাদের ভুল-ত্রুটিকে মাফ করতে কঠোর তাকিদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "তোমরা স্ত্রীগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।"

৩০। 'জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করা' কবীরা গুনাহ্। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "জায়গা জমির সীমানা যে নষ্ট করবে, তার উপর লা'নত"।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে–"যে ব্যক্তি জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করে অন্যের এক বিঘত জমি হরণ করবে, কিয়ামতের দিন তার স্কন্ধে এই পরিমাণ সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেয়া হবে।"

৩১। শ্রমিকের মজুরী কম দেয়া কবীরা গুনাহ। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে লোক শ্রমিকের শ্রমের পূর্ণ মজুরী দেয় না বা পূর্ণ মজুরী দিতে টাল-বাহানা করে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াব। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাষ্ট্রানুগত সংখ্যালঘুর উপর জুলুমকারী সম্পর্কেও এরূপ উক্তি করেছেন।

৩২। মাপে কম দেয়া কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "যারা মাপে কম দিবে, তাদের জন্য ওয়ায়েল নামক দোযখ নির্ধারিত রয়েছে"।

৩৩। দ্রব্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিত করা কবীরা গুনাহ।

৩৪। খরিদ্দারকে ধোকা দেয়া কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে আছে ঃ "যে ধোকা দিবে, সে আমার উম্মত নয়।"

৩৫। স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে, শর্তের সাথে হিলা করে পুনরায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা কবীরা গুনাহ্। একে তো তালাক কথাটাই এমন, যা অত্যন্ত ঘৃণিত। কেবলমাত্র জরুরতের কারণে এটাকে জায়িয রাখা হয়েছে। নতুবা এর চেয়ে জঘন্য জিনিস আর নেই। তাই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– "যত রকমের

www.nagorikpathagar.org

জায়িয জিনিস আছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে তালাক।" তারপর একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলা—এটা আরো খারাপ। আবার তিন তালাকের দ্বারা যে স্ত্রী হারামে মোগাল্লাযা হয়ে গিয়েছে, তাকে শর্ত করে হিলার মাধ্যমে ঘরে রাখা খুবই জঘন্য ব্যাপার। এজন্যই হাদীস শরীফে উভয়ের উপর লা'নত বর্ষিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ "যে হিলা করবে এবং যার জন্য হিলা করা হবে, উভয়ের উপরই লা'নত বর্ষিত হবে।" (মিশকাত শরীফ)

হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে আইন ছিল, যদি কেউ এভাবে হিলা করত, তবে তাকে ছঙ্গেছার করা হত অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার চাচাত বোনকে বিবাহ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাকে তিন তালাক দিয়েছিল। এখন আবার হিলা করে তাকে স্ত্রীরূপে রাখতে চায়। তিনি ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, উভয়ই যিনাকার সাব্যস্ত হবে, যদিও ২০ বৎসর পর্যন্ত গৃহবাস করে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমার চাচাতো ভাই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে এখন অনুতপ্ত হয়ে আবার হিলা করে তাকে ঘরে আনতে চায়। তিনি ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, তোমার চাচাতো ভাই এক সাথে তিন তালাক দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে, আল্লাহ তাকে এই শাস্তি দিয়েছেন। সে শয়তানের তাবেদারী করেছে, তাই আল্লাহ্ তার জন্য আর কোন পথ বাকী রাখেন নি। সকল ইমামগণের ফাতওয়াই এরূপ যে, শর্ত করে হিলা করা হারাম ও গুনাহে কবীরা।

৩৬। দাইয়্যুছিয়াত অর্থাৎ নিজের স্ত্রী, বোন বা কন্যাকে পর-পুরুষের সঙ্গে অবাধে দেখা-সাক্ষাত, মেলামেশা করতে দেয়া, পর-পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া জঘন্য কবীরা গুনাহ্ ও হারাম। এটা জাহিলিয়াতের যুগের একটি জঘন্য পাপ, যা ইউরোপ-আমেরিকার বর্বরতা বনাম আধুনিক সভ্যতার যুগে আবার চালু হয়েছে। এটা অতি জঘন্য পাপ প্রথা ও ভয়াবহ কবীরা গুনাহ্।

৩৭। 'ঘোড় দৌড় বা রেস খেলা' কবীরা গুনাহ্। যেহেতু এতে বাজী ধরা আছে। আর যাতে বাজী আছে , তা জুয়া। অতএব, এটা হারাম ও মহাপাপ।

৩৮। 'সিনেমা, টিভি ইত্যাদি দেখা কবীরা গুনাহ্। কারণ, এর মধ্যে উত্তেজনামূলক ছবির খেলা দেখানো হয়, যদ্দারা যুবকদের স্বাস্থ্য নষ্ট, সময় নষ্ট,

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ নষ্ট, স্বভাব নষ্ট ও মাতৃজাতির অবমাননা করা হয় এবং হায়া-শরম যা দ্বীনের উপর কায়িম থাকার জন্য অপরিহার্য, তা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য এটা জঘন্য পাপ। সিনেমার পার্ট ও প্লে করা, সিনেমার ব্যবসা করা, এর এডভার্টাইজ করা সবই কবীরা গুনাহ ও মহাপাপ।

৩৯। পেশাব করে পানি না নেয়া ও পাক-পবিত্র না হওয়া কবীরা গুনাহ্। পেশাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে না থাকার দরুণ কবর আযাব হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে গিয়েছেন। খৃষ্টানরা পেশাব করে পানি ব্যবহার করে না। পশুর মত দাঁড়িয়ে পেশাব করে। তাদের দেখাদেখি যারা তদ্রূপ করে, তারা বড়ই হতভাগ্য।

৩০। 'চোগলখোরী করা' ও 'কুটনামী করা' কবীরা গুনাহ।

৪১। 'গণকের কাছে যাওয়া' মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ।

৪২। মানুষের বা অন্য কোন জীবের ফটো আদর-যত্ন সহকারে ঘরে রাখা বা টাঙ্গানো কবীরা গুনাহ।

৪৩। পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরা কবীরা গুনাহ।

৪৪। পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরা কবীরা গুনাহ্।

৪৫। মেয়েলোকের জন্য শরীরের রূপ প্রকাশ পায়—এমন পাতলা লিবাস পরা কবীরা গুনাহ্। তেমনি কোন অঙ্গের অংশবিশেষ বের করে সংক্ষিপ্ত পোষাক পরা বা অঙ্গের পরিধি ফুটে উঠার মত আঁট-সাট ও চিপা পোষাক পরাও কবীরা গুনাহ।

৪৬। পুরুষদের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট পায়ের গিরার নীচে পরা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন ঃ "মাটির উপর দিয়ে গর্বভরে বিচরন করো না।" তিনি আরো বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মানুষের অহঙ্কার ও ফখর অত্যন্ত অপছন্দনীয়।"

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, তাদের সঙ্গে মেহেরবানীর কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না ঃ (১) যে অহঙ্কারের সঙ্গে লুঙ্গি-পায়জামা লটকিয়ে পরবে। (২) যে উপকার করে খোঁটা দিবে। (৩) যে মিথ্যা কসম খেয়ে জিনিস বিক্রয় করবে।

www.nagorikpathagar.org

৪৭। বংশ পরিবর্তন করা অর্থাৎ বাপের নাম বদলিয়ে দেয়া (যে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে) কবীরা গুনাহ্।

৪৮। ঝগড়া-বিবাদ করে মিথ্যা মুকাদ্দমা দায়ের করা কবীরা গুনাহ। মিথ্যা মুকাদ্দমার চালিয়ে যাওয়া বা ওকালতী করাও কবীরা গুনাহ্।

কোন মযলুমের হক আদায় করার জন্য সত্য মুকাদ্দমা দায়ের করা এবং সত্য মুকাদ্দমার তদবীর করা জায়িয আছে; কিন্তু জেনে-শুনে মিথ্যা মুকাদ্দমা করা বা তার পয়রবী করা কিংবা মিথ্যা পরামর্শ দিয়ে মিথ্যা মুকাদ্দমা সাজিয়ে দেয়া কবীরা গুনাহ্। সত্য মিথ্যা না জেনে মুকাদ্দমার তদবীর করাও দুরস্ত নয় এবং মুকাদ্দমায় জিতিয়ে দিব–এই চুক্তিতে মুকাদ্দমার তদবীর করা জায়িয নয়।

৪৯। 'মৃত ব্যক্তির জায়িয ওসীয়ত পালন না করা' কবীরা গুনাহ্। অবশ্য ওসীয়ত শরী'আত সঙ্গত হওয়া চাই। শরী'আত বিরোধী ওসীয়ত করাও কবীরা গুনাহ্ এবং তা পালন করাও কবীরা গুনাহ।

৫০। কোন মুসলমানকে ধোকা দেয়া কবীরা গুনাহ্।

৫১। 'জাসূসী করা' অর্থাৎ মুসলমান সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্রের ভেদের কথা বা দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে, অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ্।

৫২। নর হয়ে নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারী হয়ে নরের বেশ ধারণ করাও কবীরা গুণাহ। শুধু বেশ নয়, নারী হয়ে নরের সমান অধিকার দাবী করে দরবারে, মাঠে-ময়দানে এবং হাটে-বাজারে অবাধ বিচরণ করা, আর নর হয়ে অক্ষম সেজে ঘরে বসে থাকা–এটাও তারই পর্যায়ভুক্ত।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করে বলে গিয়েছেন ঃ "আল্লাহর অভিশাপ পতিত হবে সে সব নারীর উপর, যারা নরের বেশ ধারণ করবে এবং সে সব নরের উপর, যারা নারীর বেশ ধারণ করবে।"

৫৩। 'টাকা বা নোট জাল করা' কবীরা গুনাহ্।

৫৪। অন্তর এত শক্ত করা যে, গরীব-দুঃখীর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট দেখেও দরদ লাগে না, এটাও কবীর গুনাহ্।

৫৫। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় ত্রুটি করা এবং দেশের জরুরী রসদ,

www.nagorikpathagar.org

খাদ্য বা হাতিয়ার চোরা চালান বা পাচার করা কবীরা গুনাহ্।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় যে একটি রাত অতিবাহিত করবে, সে সারা দুনিয়া ব্যাপী ধন-রত্ন দান করার সমতুল্য সওয়াব পাবে।

৫৬। রাস্তা-ঘাটে বা ছায়াদার-ফলদার বৃক্ষের নীচে পায়খানা করা কবীরা গুনাহ।

৫৭। ঘর-বাড়ী, ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, মন-মস্তিষ্ক ইত্যাদি নোংরা বা গান্ধা করে রাখা কবীরা গুনাহ্।

৫৮। হায়িয নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কবীরা গুনাহ্।

৫৯। যাকাত না দেয়া কবীরা গুনাহ্।

৬০। ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করা কবীরা গুনাহ্।

৬১। মাহে রামাজানের একদিনের রোযাও বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা বা না রাখা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ্।

৬২। জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য-খাদক জিনিস-পত্র গোলাজাত করে আটক করে রাখা কবীরা গুনাহ্।

৬৩। ষাঁড় দ্বারা গাভীর বা পাঁঠা দ্বারা ছাগীর পাল দিতে না দেয়া কবীরা গুনাহ্।

৬৪। পড়শীকে কষ্ট দেয়া (যদিও সে ভিন্ন জাতির হয়) কবীরা গুনাহ্।

৬৫। যার মাল আছে, যার মাল উপার্জন করার শক্তি আছে, এমন লোকের লোভের বশীভূত হয়ে দান প্রার্থী হওয়া অর্থাৎ ভিক্ষা করা কবীরা গুনাহ্। এরূপ পেশাদার ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়াও কবীরা গুনাহ।

৬৬। জনগণ চায় না, তা সত্ত্বেও তাদের ইমামত-নেতৃত্ব করা কবীরা গুনাহ্।

৬৭। নিজের দোষ না দেখে, পরের দোষ দেখে বেড়ান এবং গর্বের সাথে নিজের প্রশংসা করা কবীরা গুনাহ্।

৬৮। বদ গোমানী করা অর্থাৎ বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে অন্য মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কবীরা গুনাহ্।

৬৯। ইল্‌মে-দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইল্‌মে-দ্বীন হাসিল না করা বা হাসিল করে আমল না করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ্। তেমনিভাবে সন্তানদেরকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা না দেয়া কবীরা গুনাহ।

www.nagorikpathagar.org

৭০। বিনা জরুরতে লোকের সামনে ছতর খোলা কবীরা গুনাহ্। পুরুষের ছতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের ছতর বেগানা পুরুষের সামনে মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর। আর নিজের মাহ্রামের সামনে বুক হতে হাঁটু পর্যন্ত সতর। তাই মাহ্রামের সামনে নারীর পেট-পিঠও খোলা থাকতে পারবে না।

৭১। মেহ্মানের খাতির, আদর-যত্ন ও অভ্যর্থনা না করা কবীরা গুনাহ্।

৭২। ছেলেদের সঙ্গে কু-কর্ম তথা পুংমৈথুন করা মহাপাপ। এটা অত্যন্ত মারাত্মক কবীরা গুনাহ্।

৭৩। আমানতদার যোগ্য সৎকর্মীকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত না করে আত্মীয়তা, দলীয় বা অন্য কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বা জনস্বার্থে অমনোযোগী হয়ে অযোগ্য, অসৎ ও অকর্মাকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত করা কবীরা গুনাহ্।

৭৪। নিজে ইচ্ছা করে বা দাবী করে অথবা জোর করে কোন পদ গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ্।

৭৫। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধী বা বিদ্রোহী হওয়া কবীরা গুনাহ্।

৭৬। নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদেরে দুনিয়াবী ব্যাপারে কষ্টে ফেলা, কিংবা পরকালীন ব্যাপারে খারাপ ও নষ্ট হতে দেয়া কবীরা গুনাহ্।

৭৭। 'খতনা না করা' কবীরা গুনাহ।

৭৮। অসৎ ও অন্যায় কাজ হতে দেখে শক্তি-সমর্থ অনুযায়ী বাধা না দেয়া, কিছু না বলা কবীরা গুনাহ্। অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা এবং তা প্রতিরোধের ফিকির না করা ঈমানের পরিপন্থী।

৭৯। অন্যায়ের সমর্থন করা কবীরা গুনাহ্। অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ ও কুফর।

৮০। আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ।

৮১। 'স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা' কবীরা গুনাহ্।

৮২। পেশাব-পায়খানা করে ঢিলা বা পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল না করে অপবিত্র থাকা কবীরা গুনাহ্।

৮৩। পুরুষ-মহিলার নাভীর নীচের পশম, বগলের পশম, নখ ইত্যাদি বর্ধিত

www.nagorikpathagar.org

করে রাখা কবীরা গুনাহ্। তেমনিভাবে পুরুষের জন্য দাড়ি মুন্ডিয়ে মেয়েলোক সাজা এবং স্ত্রীলোকের জন্য মাথার চুল কেটে পুরুষ সাজা কবীরা গুনাহ্। পুরুষদের দাড়ি লম্বা রাখা এবং স্ত্রীলোকের মাথার চুল লম্বা রাখা ওয়াজিব। নারী-পুরুষ উভয়ের নাভীর নীচের পশম ও বগলের পশম পরিষ্কার করে ফেলা ওয়াজিব।

৮৪। উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবী করা, কুরআন-হাদীসের আলেম বিশেষভাবে কুরআনের হাফেযের অমর্যাদা করা কবীরা গুনাহ্। যিনি কুরআন-হাদীসের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেন, তাকেই পীর বলে। আর উস্তাদ বলে–যিনি কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক অর্থ শিক্ষা দেন। উস্তাদ ও পীর উভয়েরই বড় হক। এরূপে যারা কুরআন শরীফ হিফ্য করে হাফেয হন বা কুরআন-হাদীসের অর্থ ও মর্ম আসল আরবী ভাষায় পাঠ করে বুঝে আমল করেন এবং মানুষকে তদানুযায়ী আমল করতে উপদেশ দেন, তাঁরা অনেক মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের প্রতি যারা আন্তরিক মর্যাদা প্রদর্শন করে না, তাঁরা মহাপাপী।

৮৫। 'শূকরের গোশ্ত খাওয়া' মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ্। এ কথা বলার দরকার ছিল না, যেমন দরকার নেই এ কথা বলার যে, মল-মূত্র ভক্ষণ করা মহাপাপ। কিন্তু যেহেতু শুনা যায় যে, যারা লন্ডন-আমেরিকা যায়, তারা নাকি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ শূকরের গোশ্ত খেতে পরোয়া করে না। সেজন্য এ কথাটাও লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

৮৬। 'হস্তমৈথুন করা' মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ্।

৮৭। ষাঁড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াইয়ের আয়োজন করা এবং তামাশা দেখা কবীরা গুনাহ্।

৮৮। কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

৮৯। কোন জীবন্ত ও জানদার জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালানো কবীরা গুনাহ্। তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল, বল্লা ইত্যাদি দুষ্ট ও কষ্টদায়ক জীব হতে বাঁচার যদি কোন উপায় না থাকে, তবে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করায় আশা করা যায় যে, কোন গুনাহ্ হবে না।

৯০। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

৯১। আল্লাহর আজাব হতে নির্ভীক হওয়া কবীরা গুনাহ্।

www.nagorikpathagar.org

৯২। হালাল জানোয়ারকে আল্লাহর নামে যবেহ না করে অন্য উপায়ে মেরে খাওয়া বা যে জীব নিয়মতান্ত্রিক জবেহ্ ব্যতীত কোন আঘাতে বা অন্য কোন উপায়ে মরে গিয়েছে, উক্ত মৃত জীব খাওয়া কবীরা গুনাহ্।

৯৩। অপচয় বা অপব্যয় করা কবীরা গুনাহ।

৯৪। বখিলী-কান্‌জুসী করা কবীরা গুনাহ।

৯৫। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন বা জারী না করা, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা বা জারী করা কবীরা গুনাহ্।

৯৬। ইসলামের বিধান মুতাবিক আইন-কানূন জারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের কোন আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা কবীরা গুনাহ্।

৯৭। ডাকাতি করা, লুটতরাজ করা বা পকেট কেটে বা হঠাৎ চোখের আড়ালে অসতর্কতার সুযোগে মাল চুরি বা ছিনতাই করা কবীরা গুনাহ।

৯৮। ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, শিকারী, কামার, কুমার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে হেকারত করা বা খাটো করে দেখা কবীরা গুনাহ্।

৯৯। বিনা ইজাযতে কারো বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের ভিতরে বা খাস কামরায় প্রবেশ করা কবীরা গুনাহ্। ইজাযতের জন্য সালাম দিয়ে সালামের উত্তর না পাওয়া গেলে, ফিরে আসতে হবে।

১০০। পরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো কবীরা গুনাহ্।

১০১। মানুষের কষ্ট হয়–এমন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশী হওয়া কবীরা গুনাহ্।

১০২। সুরত-শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিট্‌কারী বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কবীরা গুনাহ্।

১০৩। বিদ'আত কাজ করা বা বিদ'আত জারী করা কবীরা গুনাহ। হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–"কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে, যা দ্বীনের মধ্যে শামিল নয়, তবে ঐ 'নূতন বিষয়' প্রত্যাখ্যাত হবে।" অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। (মিশকাত ঃ ৩৪)

www.nagorikpathagar.org

১০৪। দুনিয়া হাসিলের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা কবীরা গুনাহ্। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-"যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ পাকের রিযা ও সন্তুষ্টি লাভ করা হয়, এমন ইল্‌মকে যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ হাসিল করার উদেশ্যে শিক্ষা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না"। (মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃঃ ৩৪)

১০৫। ইল্‌ম গোপন করা কবীরা গুনাহ্। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "কারো নিকট ইলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে, উক্ত বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৩৪)

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত 'ইল্‌মী বিষয়' দ্বারা কুরআন, হাদীস ও দ্বীনী মাস্‌আলার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনী বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেউ প্রশ্ন করলে, যদি তার উত্তর দেয়া না হয়, তবে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১০৬। জাল হাদীস বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ্। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, (অর্থাৎ জাল হাদীস বর্ণনা করে,) সে যেন দোযখে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়"। (মুসলিম, ১ ঃ ৭)

১০৭। গুনাহের কাজে মান্নত মানা কবীরা গুনাহ্। গুনাহ্রে কাজে মান্নত মানা যেমন গুনাহ্, তা পূরণ করাও গুনাহ্। তথাপি যদি কেউ কোন গুনাহের মান্নত মেনে থাকে, তার কর্তব্য হচ্ছে-সে যেন তা পূরণ না করে, বরং কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয়। তার কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারার মত।

১০৮। প্রজাদের অধিকার খর্ব করা, জনগণের হক আদায় না করা কবীরা গুনাহ্। হযরত মা'কাল বিন ইয়াছার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ জনগণের শাসক হওয়ার পর যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে স্বীয় জনগণের অধিকার খর্বকারী ছিল অর্থাৎ তাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণের ব্যবস্থা করেনি, তবে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৩২১)

১০৯। অবৈধ ট্যাক্স আদায় করা কবীরা গুনাহ্। হযরত ওক্ববা বিন আমের

www.nagorikpathagar.org

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "অবৈধ ট্যাক্স আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

শরী'আতের দৃষ্টিতে, কাষ্টম চার্জ, নগর শুল্ক ও আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ইত্যাদি আদায় করা জায়িয নয়।

১১০। ঋণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মিশকাত ঃ ২৫২)

উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ করে এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করে বা পরিশাধের কোন ব্যবস্থাও না করে শাহাদাত বরণ করে, তবে শাহাদাতের কারণে তার যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হলেও তার ঋণ ক্ষমা করা হবে না। কারণ, সেটা বান্দাহ্র হক।

১১১। দু'মুখো স্বভাব ইখতিয়ার করা কবীরা গুনাহ। হযরত আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "দুনিয়াতে যার দু'মুখো স্বভাব থাকবে, কিয়ামতের দিন তার জিহ্বা হবে আগুনের।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৪১১)

১১২। মহিলাদের খুশবু লাগিয়ে বের হওয়া কবীরা গুনাহ। আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–"গাইরে মাহরাম বা পরপুরুষকে দর্শনকারী সকল চক্ষুই ব্যভিচারিনী। আর মহিলারা যদি খুশবু লাগিয়ে কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে, তবে সে 'এরূপ' (এরূপ বলার দ্বারা ব্যভিচারিনী বুঝানো উদ্দেশ্য)। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩ ঃ ৮৪)

সুতরাং মহিলাদের বিশেষ জরুরতে পর্দা সহকারে বের হওয়া জায়িয থাকলেও খুশবু মেখে বের হওয়া জায়িয নয়।

১১৩। বিজাতিদের অনুকরণ করা কবীরা গুনাহ। ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–"যে ব্যক্তি অন্য কোন কওমের অর্থাৎ অমুসলিমদের রীতি-নীতির অনুকরণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৩৭৫) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরন করবে, সে তাদের দল ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং কিয়ামতে তাদের সাথে তার হাশর হবে।

১১৪। গোঁফ বড় করে রাখা কবীরা গুনাহ।

www.nagorikpathagar.org

যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাটবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। (মিশকাত, ৩৮১পৃঃ)

যারা বড় বড় গোঁফ রাখেন এবং গোঁফ খাট করাকে মর্যাদার খেলাফ মনে করেন, তারা উপরোক্ত হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। উল্লেখ্য, মোচ বড় বড় রাখা হিন্দুয়ানী তরীকা।

১১৫। কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা কবীরা গুনাহ। ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিশাপ করেছেন (নিজে বা অন্যের দ্বারা কৃত্রিম) চুল সংযোজন কারিণীর উপর এবং নিজে বা অপরের দ্বারা শরীর খোদাই করে নকশা বা ছবি অংকনকারিণীর উপর। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩ ঃ ১২০)

আজকাল আমাদের দেশে কিছু মহিলা ও পুরুষদেরকে দেখা যায় যে, তারা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে। যারা এরূপ করবে, তারা উপরোক্ত হাদীসের বর্ণিত অভিশাপের অর্ন্তভূক্ত হবে।

১১৬। অভিশাপ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "মুমিন কখনো অভিসম্পাতকারী হতে পারে না।" (মিশকাত ঃ ৪১৩)

১১৭। অহেতুক কুকুর পোষা কবীরা গুনাহ। হযরত আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "এমন ঘরে রহমতের ফেরেশ্তা প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি আছে"। (মিশকাত ঃ ৩৮৫)

১১৮। ছবি তৈরী করা কবীরা গুনাহ। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক শাস্তিযোগ্য অপরাধী ব্যক্তি হল চিত্র অঙ্কনকারী বা ছবি তৈরীকারী। (মিশকাত শরীফ ঃ ৩৮৫)

শরী'আত সম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে হাতে ছবি অংকন করা বা ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কোন প্রাণীর ছবি তৈরী করা বা করানো সম্পূর্ণ হারাম। তবে বৃক্ষ, ফল-ফুল, পাহাড়, মসজিদ ইত্যাদির ছবি তৈরী করা হারাম নয়।

১১৯। মাতম ও শোক প্রকাশ করা কবীরা গুনাহ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "সেই ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নয়, যে কারো মৃত্যুতে মাতম করে, মুখে আঘাত করে, জামা

www.nagorikpathagar.org

ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াতের (অর্থাৎ জাহিলী যুগের উক্ত) প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তা সকলেই করে বলে দোহাই দেয়। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ১৫০)

১২০। একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা কবীরা গুনাহ্। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "কোন ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে, আর সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় হাজির হবে।" (মিশকাত শরীফ ঃ ২৭৯)

১২১। সাহাবায়ে কিরামের মন্দ সমালোচনা করা গুনাহে কবীরা। আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–"যখন তোমরা সাহাবা কিরামের সমালোচনাকারীদের দেখবে, তখন তাদেরকে বলো–সাহাবা ও তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক।" (মিশকাত শরীফ ঃ ৫৫৪)

একথা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সমালোচকদের মধ্যে সমালোচকরাই নিকৃষ্ট। সুতরাং সমালোচকদের উপর লা'নত বর্ষিত হবে।

১২২। হাক্কানী উলামায়ে কিরামের সঙ্গে বিদ্বেষভাব পোষণ করা কবীরা গুনাহ্। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।" (মিশকাত শরীফ ঃ ১৯৭)

যে সকল ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে দ্বীনের ইল্ম ও আমলের মধ্যে লিপ্ত, তাঁরাই আল্লাহ্ওয়ালা ও আল্লাহ্র বন্ধু। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা চরম দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রাহঃ) লিখেছেন যে, আলেমবিদ্বেষীদের কবরে রাখার পর তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (মা'আরিফে আকাবির ঃ ৪০১)

১২৩। বিনা দাওয়াতে আহার করা কবীরা গুনাহ্। আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন, "কাউকে দাওয়াত করা হলে, সে যদি বিনা উজরে তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া এসে খানায় অংশগ্রহণ করে, সে যেন চোর হয়ে ঘরে প্রবেশ করল এবং ডাকাত হয়ে বের হয়ে গেল। (মিশকাত ঃ ২৭৮)

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য, বিয়ের সময় মেয়ের বাপের বাড়ীতে বরের সাথে ২/৪ জন লোক খাওয়াতে অংশগ্রহণ করা দোষণীয় নয়। কিন্তু বর্তমানে প্রথা প্রচলিত হয়েছে যে, বরের সাথে বহু সংখ্যক লোকজন শর্ত করে মেয়ের বাপের বাড়ীতে খাওয়ার মধ্যে শরীক হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের পিতা জমি বিক্রি করে বা জমি বন্ধক রেখে বা সূদের উপর ঋণ গ্রহণ করে দাওয়াতের আয়োজন করে থাকে। মেয়ের বাপের বাড়ীতে এ ধরনের খাবার মজলিসের কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না এবং এধরনের অনুষ্ঠানের খানাকে বুযুর্গানে দ্বীন ডাকাতির খানা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর থেকে পরহেয করা জরুরী। স্মরণ রাখতে হবে-কোন মুসলমানের মাল তার অন্তরের পুরোপুরি সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের জন্য কখনো হালাল হয় না।

পাপ কাজে দুনিয়ার ক্ষতি

নেক কাজ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-খোদাকে সন্তুষ্ট করা ও আখিরাতের সুখ লাভ করা এবং পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-আখিরাতের আজাব ও খোদার গযব হতে মুক্তিলাভ করা। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ লোকেরা দুনিয়ার লাভ-লোকসানটাকেই বেশী বুঝে। তাই পাপ করলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করলে দুনিয়াতে কি কি লাভ হয়, তার কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হল। আশা করা যায় যে, লোকেরা অন্ততঃ দুনিয়ার লাভের আশায় কিছু নেক কাজ করবে এবং দুনিয়ার লোকসানের ভয়ে পাপ কাজগুলো ত্যাগ করবে।

পাপ করার দরুণ ঃ (১) দ্বীনী ইল্‌ম হতে (মাকরূম) বঞ্চিত থাকতে হয়। (২) কামাই রোযগারের বরকত উঠে যায়। (৩) খোদার প্রতি মহব্বত থাকে না। (৪) সৎলোকের কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না। (৫) কাজে-কর্মে অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে পড়ে। (৬) অন্তর কাল হয়ে যায়। (৭) হৃদয়ে বল থাকে না। (৮) নেক কাজ হতে মাহ্‌রূম থাকতে হয়। (৯) হায়াত কাটা যায়। (১০) এক গুনাহের পর অন্য গুনাহ্‌ সংগঠিত হতে থাকে, তওবা করবার ইচ্ছা ক্রমশঃ কমজোর হতে থাকে। (১১) কিছু দিন পর পাপের প্রতি যে একটা ঘৃণা ছিল, সেটাও চলে যায়। (১২) মন্দ কাজে নমরূদ, শাদ্দাদ, ফির'আউন, আবু জাহ্‌ল ইত্যাদি খোদার দুশমনদের উত্তরাধিকারী ও সহগামী হতে হয়। (১৩) আল্লাহর নিকট মান-সম্মান

www.nagorikpathagar.org

কিছুই থাকে না। (১৪) অন্যান্য জীবজন্তু পাপের দরুণ কষ্ট পেয়ে পাপীর প্রতি লা'নত করে। (১৫) জ্ঞান বুদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। (১৬) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বদ দু'আর ভাগী হতে হয়। (১৭) ফেরেশ্তাদের নেক দু'আ হতে মাহরূম থাকতে হয়। (১৮) দেশের শস্য-ফসলাদিতে বরকত থাকে না। (১৯) শরম-ভরম চলে যায়। (২০) আল্লাহ তা'আলার ভক্তি অন্তর হতে উঠে যায়। (২১) আল্লাহর নেয়ামত হতে মাহরূম হয়ে যায়। (২২) বালা-মুসীবত নাযিল হয়। (২৩) তাঁকে প্রশংসাস্থলে নিন্দা করা হয়। (৩৪) শয়তান তার চিরসাথী হয়ে যায়। (২৫) তার দিল পেরেশান থাকে। (২৬) মৃত্যুকালে তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হয় না। (২৭) খোদা তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে অবশেষে তওবা ব্যতিরেকেই তার মৃত্যু হয় ইত্যাদি।

নেক কাজে দুনিয়ার লাভ

(১) নেক কাজ করার ফলে কামাই রোযগারে বরকত হয়। (২) কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়। (৩) দিলের মকসুদ সহজে পুরা হয়। (৪) জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। (৫) দেশে রীতিমত বৃষ্টি হয়। (৬) অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় না। (৭) বালা মুসীবত দূর হয়। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা সকল কাজে মদদগার হন। (৯) নেক লোকের অন্তর নেক কাজের প্রতি মজবুত রাখার জন্য ফেরেশ্তাদের হুকুম করা হয়। (১০) খাঁটি সম্মান পাওয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। (১১) লোকের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়। (১২) কুরআন শরীফ তার জন্য রহমত হয়। (১৩) জানের বা মালের ক্ষতি হলে তার পরিবর্তে উত্তম জিনিস পাওয়া যায়। (১৪) ক্রমশঃ নেয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মালও বাড়তে থাকে। (১৫) দিলে শান্তি আসে। (১৬) আওলাদের মধ্যেও এর প্রভাব পৌছে। (১৭) জীবিত অবস্থায়ই গাইব হতে সুসংবাদ পাওয়া যায়। (১৮) মৃত্যুকালে ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদ শুনান। (১৯) অভাবের সময় মদদ পাওয়া যায়। (২০) অন্তরের বিশৃঙ্খল চিন্তা-ভাবনা দূর হয়। (২১) রাজত্ব ও কর্তৃত্ব স্থায়ী হয়। (২২) আল্লাহর গজব দূর হয়। (২৩) আয়ু বৃদ্ধি পায়। (২৪) অনাহার ও অনশন কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায়। (২৫) অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয় ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

তাওবার বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটিভাবে তওবা কর"। (সূরাহ্ তাহরীম ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "গুনাহ্ থেকে তওবাকারী এমন পবিত্র হয়ে যায় যে, যেন তার কোন গুনাহই নেই"। (ইবনে মাজা ঃ ৩১৩ ও বাইহাকী)

খালিস তওবা কাকে বলে ? জনৈক বযুর্গ অতি সংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন ঃ "গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলাকেই তওবা বলে"।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ "অনুতপ্ত হওয়াই তওবা" ।(ইবনে মাজা ঃ ৩১৩)

খালিস তওবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে ঃ (১) গুনাহের কাজ স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব করা। (২) সঙ্গে সঙ্গে ঐ অন্যায় কাজ তরক করে দেয়া। (৩) ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনো এমন কাজ করব না এবং নফস যখন আবার সেই কাজ করার খায়েশ হয়, তখন তাকে দমন করে রাখা। আর খোদার কাছে এমন কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাওয়া, যেমনিভাবে মাফ চেয়ে থাকে কোন চাকর, যখন সে তার মালিকের নিকট অপরাধ করে ফেলে। সে কাকুতি-মিনতি করে মালিকের হাত জড়িয়ে ধরে, পায়ে পড়ে, কাতর স্বরে কেঁদে কেঁদে অনেক রকম খোশামোদ করে, প্রশংসা করে, একবারের জায়গায় দশবার বলে বলে মাফ চায়। তাই খোদার কাছে অন্ততঃ এতটুকু তো করা উচিত।

আর উক্ত ত্রুটির জন্য তওবার সাথে শরী'আতে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিকার শুরু করে দেয়া উচিত। যেমন, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় না করে থাকলে, সেগুলো হিসেব করে আদায় করা উচিত। কিন্তু সেগুলোর চূড়ান্ত হিসেব করা সম্ভব না হলে, মনের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হিসাব করে পিছনের সবগুলোর কাযা আদায় শুরু করে দেয়া কর্তব্য। কাযা আদায় শেষ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু এসে গেলে সেগুলো আদায় করার জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

খোদা না করুন, কারো থেকে কালিমায়ে কুফর বা শিরক প্রকাশ পেলে, তার

www.nagorikpathagar.org

জন্য কালিমা পড়ে নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে এবং বিবাহ্ দোহরাতে হবে। কেউ যদি অন্যের অর্থ অবৈধভাবে নিয়ে থাকে, তাহলে সে অর্থ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যে পরিমাণ হয়, তা মূল মালিককে পৌছে দিবে। মালিক না থাকলে, তার ওয়ারিসদেরকে পৌঁছে দিবে। তাদেরকেও না পেলে মূল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিবে।

এসব বিষয় খালিস তওবার জন্য একান্ত জরুরী। এরকম খালিস তওবা করলে, আল্লাহ্র ওয়াদা আছে যে, নিশ্চয় তিনি তওবা কবুল করে নিবেন এবং তওবাকারীকে ক্ষমা করে মুহাব্বত করবেন।

তাওবার কবুলিয়্যত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন,

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُوْلٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا - وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ - حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ - اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

"অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুল বশতঃ মন্দ কাজ করে অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হল সেসব লোক–যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ 'আমি এখন তাওবা করছি।' আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ১৭-১৮)

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাঠিয়েছেন খলীফারূপে, তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। জান্নাত হতে নির্বাসিত মানুষ যাতে তার সঠিক সরল পথ ভুলে না যায়, সে জন্য যুগে যুগে এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল (আঃ)। মানুষের জীবন পদ্ধতির সঠিক রূপরেখা বর্ণনা দিয়ে বহু আসমানী গ্রন্থ এসেছে সেসব নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের আলোক বর্তিকা দ্বারা জীবন চলার পথ ও পাথেয় উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। পবিত্র কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীস। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্ম ও রাজনীতির একই সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে ইসলাম। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রেরিত ইসলামী মতাদর্শ বাদ দিয়ে কারো ব্যক্তিগত তথা মানব রচিত আইন বা মতবাদ দিয়ে দেশ শাসন করা বা এ জন্য আন্দোলন করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয। অথচ কমিউনিজম এবং সোশ্যালিজমের নেতারা কথার বুলি আওড়াতে গিয়ে বলে থাকে, "ইসলাম মানব জাতিকে যে সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়েছে, আমরা জাতিকে সেই সাম্যবাদের দিকেই আহবান করি। সমতার দিক দিয়ে ইসলামের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই; বরং ইসলামের শিক্ষাকেই আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই সাম্যবাদের মাধ্যমে।"

উক্ত নেতাদের এসব বক্তব্য-বিবৃতি ষোল আনাই ধোকা, সত্যের অপলাপ এবং মধুর নামে বিষ পান করানোর অপচেষ্টা মাত্র। শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রচার করা হারাম। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

উভয়ই ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তেমনিভাবে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আরেক শরী'আত বিরোধী আওয়ায। ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে তো কোন ধর্মই নেই।

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে-"জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।" গণতন্ত্রের মর্মবাণী ঃ Govt. of the people by the people for the people. সরকার জনগণের মধ্য হতে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর সমাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় পার্টি। জনগণ হয় পার্টির সদস্য। বুঝা গেল, উভয় তন্ত্রেরই মূল বক্তব্য-জনগণ সর্বময় ক্ষমতার উৎস। অথচ ইসলাম সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে। মোদ্দাকথা, ইসলামের বুনিয়াদ খোদায়ী শক্তির উপর। আর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ জনগণ তথা বস্তুর উপর। মূলভিত্তি হতেই শুরু হয় ইসলামের সাথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘাত। সুতরাং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তাই এতদুভয়ের কোনটাই ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারে না।

নেতা নির্বাচনের বেলায় ইসলামের শিক্ষা হল-সমাজের আলেম, জ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বীনদার ব্যক্তিগণের পরামর্শের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত যোগ্যতম ব্যক্তি শাসনকার্যে নিযুক্ত হবেন। নেতা বা শাসক নির্বাচনের ব্যাপারে অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের রায় বা পরামর্শের কোন মূল্য নেই। জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা শাসক নির্বাচিত হবার পর দেশবাসী সকলেই তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)কে মান্য কর। আর যে আমীর আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মত হুকুম করে, তার অনুগত হও।" (সূরাহ্ নিসা ঃ ৫৯)

রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেন-"তোমরা আমীরের কথা মেনে চল, যদিও কোন হাবশী নাককাটা গোলামকে (তার যোগ্যতার কারণে) তোমাদের আমীর নির্বাচিত করা হয়।" (তিরমিযী শরীফ)

পক্ষান্তরে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সমাজসচেতন জ্ঞানী লোকেদের দ্বারা নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য শিক্ষা দেয় না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে মানতে শিখায়। যদিও সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বোধ ও বোকা লোকদের হয়।

অথচ পবিত্র কুরআন সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মানার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-"যদি তুমি অধিকাংশের কথা অনুসরণ কর, তাহলে অধিকাংশের রায় তোমাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।" (সূরাহ আন'আম ঃ ১১৬)

www.nagorikpathagar.org

কারণ, এটা বাস্তব সত্য কথা যে, দুনিয়াতে সব সময় ভালোর চেয়ে মন্দ বেশী থাকে। যেমন, শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। জ্ঞানীর চেয়ে মূর্খ-নির্বোধের সংখ্যা বেশী। এমনিভাবে সৎলোকের চেয়ে অসৎলোকের সংখ্যা বেশী। এ ক্ষেত্রে যদি অধিকাংশের রায়ের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে সেখানে নির্বোধ, অশিক্ষিত, অযোগ্য ও অসৎ লোকদের দখলদারিত্ব জয়ী হবে। তাই এ সিদ্ধান্তে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য–গণতন্ত্রে শুধু সংখ্যার হিসেবই পরিগণিত হয়, সেখানে বিবেক-বুদ্ধির হিসেব করা হয় না। এ জন্যে ইসলাম গণতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে।

এ সত্যটি না জানার কারণেই অনেকে গণতন্ত্রের জন্য দরদী হয়ে জোর গলা হাঁকছেন। আবার অনেকে ইসলাম কায়িম করার কথা বলে গণতন্ত্র কায়িম করার পিছনে দৌড়াদৌড়ি ও লেজুড়বৃত্তি করে চলেছেন।

সমাজতন্ত্রের কুফরী দিক সমূহ

সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নাস্তিকতার উপর। ধর্মদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করা হল সমাজতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ। তাদের ভাষায়–ধর্ম হল উন্নতির পথে বাধা। দোকান বন্ধ করলে, ব্যবসায় ক্ষতি হয়। হজ্জ আদায়ের দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা আসে, কাজ-কর্মে বিঘ্ন ঘটে এবং সম্পদ নষ্ট হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনে হালাল-হারাম বের করলে, অবাধ উপার্জনের পথ রুদ্ধ করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করে দেশের জমি সংকীর্ণ করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেশের জনসাধারণের মধ্য থেকে গোটা দেশটা যেন তাদের। আর ধর্মের অনুসারীরা আবর্জনার বোঝা বৈ কিছুই নয়। সুতরাং তাদের অধিকারের যেন প্রশ্নই উঠে না।

তাইতো সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা 'কাল মার্কস' ও তার রূপকার 'লেনিনে'র চিন্তা-ধারার সারমর্ম ছিল–"নিখিল বিশ্বে কোন স্রষ্টা বা খোদা বলতে কিছুই নেই। বরং গোটা বিশ্ব জড় পদার্থের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে।" কমিউনিস্টদের দাবী হল, "আমরা যেমনিভাবে পৃথিবীর রাজাদেরকে সিংহাসন থেকে নীচে ফেলে দিয়েছি, তেমনিভাবে আকাশের বাদশাহকেও আরশ হতে নীচে নিক্ষেপ করেছি।" (নাউযুবিল্লাহ)

জার্মানীর একজন নওমুসলিম 'মুহাম্মদ আসাদ' পর্যটক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বচক্ষে যা অবলোকন করেছেন, তা তিনি নিজের ভাষায় বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

করেন–"সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে বড় বড় পোস্টার ছেপে স্টেশন, সড়ক ও টার্মিনালে ঝুঁলিয়ে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে চিত্রাকারে দেখানো হয়েছে যে, একজন সাদা দাড়ি বিশিষ্ট আবা পরিহিত দ্বীনদার ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন আসমান থেকে নেমে আসছেন, আর মজদুরদের ইউনিফর্ম পরিহিত কমিউনিষ্ট যুবকরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে নীচে অবতরণ করাচ্ছে। এ ছবির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে–"সোভিয়েত ইউনিয়নের মজদুরগণ এমনিভাবে খোদাকে আরশ থেকে নীচে নিক্ষেপ করেছে।" (নাউযুবিল্লাহ)। (দি রোড টু মক্কা, ২৯৯ পৃঃ।)

সমাজতন্ত্রের উত্থানের পর রাশিয়ায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রকৃষ্ট নজীর সুস্পষ্ট। তখন রাশিয়ার ৩১ হাজার মসজিদ ও ২৫,৫০০ মাদ্রাসার অধিকাংশই ধুলিস্মাৎ করে ফেলা হয়। এমনিভাবে রাশিয়ায় অসংখ্য উলামায়ে কিরামের সমাবেশ ছিল। তাদের মধ্য হতে ৫০,০০০ শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামকে শহীদ করে ফেলা হয়। অবশিষ্টগণ বিভিন্ন দেশে হিজরত করেন। ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত অধ্যায় সুদীর্ঘ সত্তুর বছর দুর্দান্ত প্রতাপে ক্ষমতা ধরে রেখেও কমিউনিষ্টরা মুছে ফেলতে পারেনি।

বস্তুতঃ এ রকম পশুত্ব আর বর্বরতাকে কোন দেশ ও জাতি কোন কালেই সহজে গ্রহণ করেনি। এর প্রমাণ স্বয়ং স্টালিনের ভাষ্য। তিনি মানাটার কনফারেন্সে বর্ণনা করেন–"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমাদের এত লোক খতম করতে হয় নি, যত লোক খতম করতে হয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে।"

দৈনিক আঞ্জাম ১৩/১১/৬৭ ইং সংখ্যায় চীনের একজন প্রতিনিধি রিপোর্ট করেন যে, "সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দেড় কোটি জমিদারকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছি।"

বেশী পিছনে যেতে হবে না, হাল জামানার আফগানিস্তান এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার কুখ্যাত লাল ফৌজ সুদীর্ঘ তের বছরে অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করেছে, শত শত মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করেছে। আজ কমিউনিষ্টমুক্ত আফগান এক প্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

মোদ্দাকথা, সমাজতন্ত্র কখনো ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তা ইসলামকে নির্মুল করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম তাদের চক্ষুশুল। ইসলামকে চিরতরে ধ্বংসের জন্যই কালমার্কস, লেলিন প্রমুখ ইয়াহুদী সন্তানরা সমাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা মিথ্যা প্রহসনমূলক চালবাজী খাঁটিয়ে তাদের ইজমকে বাজারজাত করতে চায়। তাই কোন দেশে এই পশু ইজমকে চালু করতে হলে,

www.nagorikpathagar.org

প্রথম স্তরে সমাজতন্ত্রকে ইসলামী ইনসাফ, আদলে ফারূকী ও খিলাফতে রাশিদার যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জোরদার প্রচারণা চালানো হয়। তাদের এমনও বলতে শোনা যায় যে, ইসলাম আর সমাজতন্ত্রের শিক্ষা এক, অভিন্ন। শুধু নামে মাত্র পার্থক্য। এ স্বার্থমাখা চিত্তাকর্ষক বুলির কারণে অনেক সরলপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে এসে তারা নানাবিধ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ইসলামের আরকান, ইবাদত ও উলামায়ে কিরামের উপর হালকা হামলা শুরু করে। রেডিও-টেলিভিশন, ড্রামা-পোস্টার ইত্যাদিতে নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানাবলীকে পরিহাসরূপে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে যুব সমাজের মনে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তারা ধর্মীয় জীবনকে মনে করতে থাকে অন্ধত্ব। সমাজের আলেম ও ধর্মানুরাগী মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সৃষ্টির জন্য সর্বত্র প্রচেষ্টা চালানো হয়। এমনিভাবে কৌশল স্বরূপ চোর-গুন্ডা, বদমায়িশদেরকে দাড়িওয়ালা, পাঞ্জাবী-টুপি পরিহিত অবস্থায় নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থাপন করে ধর্মীয় লিবাস-পোষাক ও আচার-আচরণের প্রতি জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি করা হয়। তৃতীয় স্তরে তারা জনসাধারণ বিশেষ করে যুব সমাজের মনে উলামায়ে কিরামের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে। জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে। নানা কৌশলে তখন দেশের প্রবীণ মুসলমান ও উলামায়ে কিরামকে হত্যা করতে শুরু করে দেয়। ধর্মকে আফিম বলে ধর্মশালা, মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় কিতাব-পত্র সমূলে ধ্বংস করতে শুরু করে। ধর্মকে উৎখাত করতে তারা পাশবিকতা ও বর্বরতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে। দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে শাহাদত বরণ করেন, আর অনেকে শেষ সম্বল ঈমানটুকু নিয়ে কোন দেশে হিজরত করতে বাধ্য হন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ।

সমাজতন্ত্রে বাক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়। যার ফলে যাকাত ও হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরীজা বিলুপ্ত হয়। কারণ, মালের ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে, যাকাত ও হজ্জ কিরূপে বিধিবদ্ধ হবে? তাই সমাজতন্ত্রের মূল থিউরীতে বিশ্বাসী কোন মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না। বরং সে ধর্মোদ্রোহী কাফিরে পরিণত হয়। এতটুকুতেই সমাজতন্ত্রের স্বার্থকতা।

দেশ ও জনগণের জন্য শান্তির কোন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে করতে পারে না, তা আজ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সমাজতন্ত্র যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, সে সত্য আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। হালের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এর চাক্ষুষ প্রমাণ।

বর্তমান সভ্যতার দু'টি ভাগ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। মানবতা বিরোধী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে গুটিকয়েক লোকের হাতে দেশের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ কারণেই পুঁজিবাদের চরম পর্যায়ে জন্ম নেয় সমাজতন্ত্র। কাজেই দেখা যায়–পুঁজিবাদ তথা গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। পুঁজিবাদ তথা গণতন্ত্রের অসারতার পর সমাজতন্ত্র যেহেতু প্রাণহীন লাশ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আর তার ধ্বজাধারীরা আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান, অনুশোচনা করছে অতীতের ভুলের জন্য, সুতরাং এ দু'টি মতবাদের কোনটিই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। বরং এগুলো বিপর্যয় ও জাতি ধ্বংসের যাঁতাকল মাত্র।

অতএব, একথা সহজেই অনুমেয় যে, ইসলাম বহির্ভূত মানবীয় সব মতবাদ মরীচিকা তুল্য। ইসলাম ব্যতীত কোন রাস্তাই কল্যাণকর নয়। তাই গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের সদল বলে ইসলামের শান্তিময় পতাকা তলে ফিরে আসা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তাওফীক দান করুন।

কুরআনের আলোকে গণতন্ত্রের অসারতা

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে, প্রচলিত গণতন্ত্র অসার ও ভিত্তিহীন। দ্বীন ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বর্তমান গণতন্ত্রের বা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাতুলতার ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(১) "আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়।"(সূরাহ্ ইউসুফ, ১০৩)

(২) "কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না।"(সূরাহ্ মু'মিন, ৫৯)

(৩) "তাদের অধিকাংশেরই বিবেক-বুদ্ধি নেই।" (সূরাহ্ মায়িদা)

(৪) "কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না।" (সূরাহ্ ইউসূফ, ৫৮)

(৫) "কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।" (আন'আম, ১১১)

(৬) "কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য দ্বীনে নিস্পৃহ"। (সূরাহ্ যুখরুফ, ৭৮)

(৭) "তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান।" (সূরাহ্ মায়িদা, ৫৯)

(৮) "তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ ও অনুমানের উপর চলে। অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না।" (সূরাহ্ ইউনুস, ৩৬)

(৯) "নিশ্চয় বহু লোক আমার মহাশক্তির ব্যাপারে উদাসীন।" (ইউনুস, ৩৬)

(১০) "তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।" (সূরাহ্ আরাফ, ১০)

(১১) "তাদের পূর্বেও অধিকাংশ লোক বিপথগামী হয়েছিল।"(সাফ্ফাত,৭১)

(১২) "তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস করবে না।" (সূরাহ্ ইয়াসীন, ৭)

(১৩) "অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি।" (সূরাহ্ হজ্জ, ১৮)

www.nagorikpathagar.org

(১৪) "আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে বহুবার সামান্য দল বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছে।" (সূরাহ্ বাকারা, ২৪৯)

(১৫) "হুনাইনের দিনে তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন-যখন তোমাদের আধিক্য তোমাদেরে প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফয়সালার মুকাবিলায় তা কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তোমরা পলায়ন করেছিলে।"

(১৬) "আপনি বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে।" (সূরাহ্ আল মায়িদা, ১০০)

(১৭) "যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথা বলে থাকে।" (আন'আম, ১১৬)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অধিকাংশেরই শিক্ষা নেই, জ্ঞান নেই, অধিকাংশ লোকই সত্য সন্ধানী নয়; সতর্কতা ও বিবেক বুদ্ধির অধিকারী নয়; প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী নয়; জান্নাতী হওয়া, আখিরাতের শাস্তি বা আজাবের তোয়াক্কা করে না। পবিত্র কুরআন আরো ঘোষণা করছে যে, সংখ্যাধিক্য তথা গণতন্ত্র সত্যের মাপকাঠি হওয়া তো দূরের কথা, এর মূল ও কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়েছে গলদ ও ভ্রান্তি। কেননা, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই জাহান্নামের পথে গমনকারী, গুমরাহ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, উদাসীন, আন্দাজপূজারী, সত্যনিস্পৃহ, নির্বুদ্ধিতা সম্পন্ন, অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার। সুতরাং এ জন্য তাদের রায়ের দ্বারা কোন সঠিক বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেবল সংখ্যাধিক্য ইসলামী মূলনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই একে কোন সমস্যার সমাধান প্রদানের মাপকঠি মানা যায় না।

অবশ্য হাক্বানী উলামা ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীগণের অধিকাংশের রায়কে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ফয়সালা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগে সকল গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত এর ভিত্তিতেই নেয়া হতো।

গণতন্ত্রের কুফরী দিকসমূহ

মহান আল্লাহ বলেন-

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِىْ الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ·

"আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে নেন, তাহলে তারা আপনাকে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক-কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথা-বলে থাকে।" (সূরাহ্ আন'আম, ১১৬)

কুরআনে কারীমে এমন অনেকগুলো আয়াত রয়েছে, যেসব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রচলিত পশ্চিমা গণতন্ত্র সমর্থন করে না। এর সামান্য পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে–পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলাম সম্পূর্ণ একে অপরের বিপরীত। গণতন্ত্র স্বীকার করলে, কুরআনকে পূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। আর কুরআনকে পূর্ণভাবে মানলে প্রচলিত গণতন্ত্র স্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে সর্বযুগে জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকের সংখ্যা কম রেখেছেন। নির্বোধ, অবুঝ ও কমবুদ্ধির লোক বেশী রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, "অধিকাংশ মানুষই মূর্খ।" (সূরাহ্ আন্আম, ১১২)

অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রে জ্ঞানী-গুণীর বুদ্ধি পরামর্শের আলাদা কোন মূল্যায়ন করা হয় না। একজন বিবেকহীন মানুষের মতামতের যে মূল্য, একজন জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমতেরও সেই মূল্য। যারা বড় বড় পোষ্ট ও পদের ব্যাপারে কোন খবরই রাখে না, তাদেরকে সেই ব্যাপারে রায় দিতে বলা হয়। অথচ তাদের মাঝে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মত বিবেক-বিবেচনা বিদ্যমান নেই। সুতরাং তারা কখনো ভাল ও যোগ্যতম লোক নির্বাচন করতে পারে না। ফলে তাদের রায়ের ভিত্তিতে অযোগ্য লোকই ক্ষমতায় যাওয়ার বেশী সম্ভাবনা এবং এতে কোন প্রতিষ্ঠান বা দেশ যে সুন্দরভাবে চলতে পারে না, এ কথা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করাও বোকামী।

গণতন্ত্রের ফর্মূলায় বলা হয় যে, "জনগণেরই দ্বারা জনগণেরই জন্য নির্বাচিত।" এ কথাটির মারাত্মক পারণতি এই যে, গণতন্ত্রের এ ফর্মূলা দ্বারা গণতন্ত্রীগণ বলে থাকেন, জনগণ ক্ষমতার উৎস। অথচ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, "সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।" (সূরাহ্ বাকারা, ১৬৫) সুতরাং কোন মুমিন কুরআনের বিরুদ্ধে কোন মতবাদ গ্রহণ করতে পারে না।

তাছাড়া এ পদ্ধতির মাধ্যমে যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তাদের এমন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক বানানো হয় যে, তারা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধেও আইন পাশ করতে পারে। তারা যেন সকল প্রকার শরয়ী জওয়াবদিহিতারও উর্ধে। যেমন, শরী'আতে

www.nagorikpathagar.org

চোরকে হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মদখোরকে জন সমক্ষে ৮০ ঘা বেত লাগানোর হুকুম দেয়া হয়েছে, অবিবাহিত যিনাকারীকে ১০০ ঘা বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম দেশের পার্লামেন্টের সদস্যরা এর কোনটাই বাস্তবায়ন না করে মনগড়া ভাবে এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করছে। পরন্তু তারা কুরআনের বিধানকে সেকেলে ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী, বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। অন্য কোন ব্যক্তি বা দলের এ অধিকার নেই। (সূরাহ্ ইউসুফ ঃ ৪০) তাই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিধান দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করলে, তাকে বিধানদাতা আল্লাহ্র সাথে শরীক করা হয়। যেমন, হাদীসে এসেছে, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয় যে, "তারা তাদের পাদ্রীদেরকে ইলাহ্ বা মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরাহ্ তাওবা, ৩১) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) বললেন, তারা তাদের পাদ্রীদেরকে ইলাহ্ বা মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে–এর অর্থ এই নয় যে, তারা পাদ্রীদের ইবাদত বা পূজা করতো, বরং তাদের পাদ্রীরা তাদের কিতাবের কতিপয় হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছিল, আর তারা সেগুলো মেনে নিয়েছিল। এটাকেই বলা হয়েছে, "তারা তাদের পাদ্রীদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে।" (তিরমিজী, ২ ঃ ১৪০/ দুররে মনসুর, ৩ ঃ ২৩০/ তাফসীরে মাজহারী, ৪ ঃ ১৯৪)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধে অন্য আইন পাশ করে বা কোন কানুন ঘোষণা করে এবং জনগণ তা মেনে নেয়, তাহলে বস্তুতঃ এর দ্বারা বান্দাহকে ইলাহ্ বানানো হয় এবং বিধানদাতা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং বান্দাহকে বিধানদাতা মানলে, তাকে খোদার আসনে বসানো হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণের মধ্যে অন্যকে শরীক করা হয়, যা শিরক মহাপাপ এবং নিজের ঈমানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

তাছাড়া প্রচলিত গণতন্ত্রে বিতর্কিত কোন বিষয়ের সমাধানের জন্য পার্লামেন্টে বা জনগণের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হয়, এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কি সিদ্ধান্ত দেয়া আছে, তা ঘুর্ণাক্ষরেও দেখা হয় না। অথচ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হলো–"কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে গেলে, বা ফয়সালা করাতে হলে, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।" (সূরাহ্ নিসা- ৫৯)

গণতন্ত্রের কোন ঠিকাদারকে যদি বলা হয় যে, এ মতবাদ যখন এতই উত্তম.

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং তোমরা নিজেদের এলাকায় যেসব স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করো, তার দায়িত্বশীল কে কে হবেন এবং সেটা কিভাবে পরিচালিত হবে, এর জন্য কোন কমিটি বা পরিষদ গঠন না করে তার স্থলে এলাকার সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ডেকে ভোট গ্রহণ কর, কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন দরকার নেই। তখনই তাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। তারা কখনো একথা মানবে না যে, পাবলিকের ভোটে এগুলো নির্ধারণ করা হোক; বরং তারা বলবে যে, মূর্খ লোকেরা এগুলো কি বুঝবে? তাহলে প্রশ্ন হয়, যে পদ্ধতি দ্বারা একজন হেড মাষ্টার বা প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা যায় না, সে পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রীবর্গ কিভাবে নির্বাচিত হতে পারে? একটা দেশ কি প্রাইমারী স্কুল থেকেও ছোট বা কম গুরুত্ব রাখে? এধরণের বহু দিক দিয়ে প্রচলিত গণতন্ত্র কুরআনের সাথে সংঘর্ষশীল এবং সহীহ্ আক্ল ও বিবেকের পরিপন্থী।

অপরদিকে শরী'আত এমন সুন্দর বিধান দান করেছে, যার নজীর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারবে না। শরী'আতের নির্দেশ হলো-দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম শ্রেণী ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের সমন্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ থাকবে। যা স্থায়ী হবে, যার কোন সদস্যের বিয়োগ ঘটলে, পরামর্শের ভিত্তিতে তার স্থলে যোগ্য লোক মনোনীত করা হবে। এ মজলিসে শূরা-ই আমীরুল মুমিনীন (প্রেসিডেন্ট) থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জিম্মাদার (মন্ত্রী) মনোনীত করবেন। এমনকি বিভাগীয় প্রধান, জেলা প্রধান, থানা প্রধানদেরকেও তারা মনোনীত করবেন। তখন প্রচলিত ধোকা ও ফাঁকিবাজির নির্বাচনের কোন দরকারই পড়বে না। কোন প্রার্থীর চরিত্র ফুলের মত পবিত্র প্রমাণ করতে পাঁচ দশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে না। এত টাকা খরচ করে যদি কেউ পাশ করেও, তাহলে সে জনগণের খিদমতের চেয়ে তার টাকা উসুল করার ফিকিরে বেশী ব্যস্ত থাকবে। শরী'আতে টাকা খরচ করে পদ হাসিল করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থনা করবে, শরী'আতের নির্দেশ হচ্ছে-তাকে সে পদ দেয়া হবে না। বরং যোগ্যতম ব্যক্তিকে অনেক সময় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দায়িত্বে বসানো হবে। এর দ্বারা দেশের কোটি কোটি টাকার অপচয় বন্ধ হবে এবং নির্বাচন উপলক্ষে যে শত শত লোকের জান চলে যায়, শত শত মহিলা বিধবা হয়, হাজার হাজার বাচ্চা ইয়াতীম হয়, এসব একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে আরো অনেক অনিষ্টতা থেকে দেশ হিফাজতে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখিত মজলিসে শূরা একটি আইন পরিষদ গঠন করে দিবে। আইন পরিষদের সদস্যরা নিজে কোন আইন প্রণয়ন করবে না, বরং প্রত্যেক বিষয়ের সমাধান কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে খুঁজে খুঁজে বের করবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। (সূরাহ্ মায়িদা ঃ ৩)

সুতরাং মুসলমানদের জন্য নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে খুঁজে বের করবে–এতটুকুর প্রয়োজন অবশিষ্ট আছে। তাও সব বিষয়ে নয়, নবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মৌলিক সকল বিষয় এসে গেছে। সমকালীন যুগের কিছু নতুন সমস্যাবলী কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে খুঁজে বের করতে হয়। কুরআন-সুন্নাহ্ এমন কিতাব যে, এর আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জরুরত বা সমস্যা উদ্ভাবিত হবে, তার সমাধান বের করা সম্ভব। কেননা, কুরআন তো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সবই তো তাঁর ইল্‌মে আছে।

উক্ত মজলিসে শূরা প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ-এর জিম্মাদারও মনোনীত করে দিবেন। তারা আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত খোদায়ী কানূন দেশের সর্বত্র জারী করবেন এবং সকল মামলা মুকাদ্দমা, আইন-আদালতই উক্ত কানূনের ভিত্তিতে পরিচালনা করবেন, সমাধান দিবেন।

সারকথা, মজলিসে শূরার মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রধান এসব কাজ আন্‌জাম দিবেন। তাছাড়া যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রপ্রধান একা করবেন না; বরং মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী করবেন এবং উক্ত মজলিসে শূরা যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ, সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্য কোন বিভাগীয় প্রধান যদি দায়িত্ব পালনে অপারগ হন বা খিয়ানত করেন অথবা ইনতিকাল করেন, তাহলে মজলিসে শূরা তার স্থলে অন্য লোক মনোনীত করবেন।

এ হলো ইসলামী হুকুমত পরিচালনার অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এটা এজন্য পেশ করা হলো, যাতে করে প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামী বিধানের পার্থক্য বুঝতে কিছুটা সহায়ক হয়।

প্রচলিত গণতন্ত্রকে সংক্ষেপে বুঝার জন্য এটাকে বাদশাহ্ আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ তথা দ্বীনে ইলাহীর সাথে তুলনা করা চলে। কারণ, আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ন্যায় এটাও একটা বাতিল মতবাদ বা বাতিল ধর্ম, যা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে। দ্বীনে ইলাহী দ্বারা বাদশাহ্ আকবর

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু-মুসলমানদের এক করতে চেয়েছিল, আর গণতন্ত্রের এ বাতিল ধর্ম দ্বারা খৃষ্টানরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে এক করে তাদের তাবেদার বানাতে চায়। এ বাতিল ধর্মের নীতি-বিধান হলো গণতন্ত্রের ফর্মূলা এবং এ ধর্মের স্বঘোষিত দেবতা হলো এর ধারক বাহকরা। ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা এ বাতিল ধর্মকে অধিকাংশ পৃথিবীর মধ্যে কায়িম করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানগণ দ্বীনী ইলমের অভাবে উন্নত মতবাদ মনে করে এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও কুরআনী বিধানকে বাদ দিয়ে এ বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা এরূপ যে, যেখানেই গণতন্ত্রের দেবতাদের ধারণায় গণতন্ত্র লংঘিত হচ্ছে, সেখানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তারা বাহিনী পাঠাচ্ছে। তবে কোথাও গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী দল অগ্রসর হলে, দেবতারা সেটাকে প্রত্যাখান করছে এবং তাকে তাদের ফর্মূলা অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য বলছে। তার ধ্বংস সাধনে সেদেশের সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রা নষ্ট করে দিচ্ছে। এভাবে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা সারা বিশ্বের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে এবং প্রভুত্ব করছে। অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ ফির'আউনের যমানার ন্যায় গণতন্ত্রের দেবতাদেরকে বড় খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছে। ঐ সব দেবতারা মুসলমানদের থেকে চাঁদা নিয়ে জাতিসংঘের নামে মুনাফেকী করে মুসলিম নিধনে তৎপর আছে। এমন কি তারা এ ঘোষণা দিতেও দ্বিধা করছে না যে, দু'হাজার সাল নাগাদ ইসলাম ধর্মই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা।

অপর দিকে অর্ধ শতেরও বেশী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ নীরব, নির্বিকার। এত কিছুর পরও তারা গণতন্ত্রের দেবতাদেরকে মুসলমানদের খায়েরখা বলে বিশ্বাস করছে। তাদের নিদ্রা কোন ভাবেই ভাংছে না। সমগ্র বিশ্বের এই একই চিত্র। সব জায়গায় মুসলমান মার খাচ্ছে। কাফির-মুশরিক মার দিচ্ছে। আর গণতন্ত্রের ঐ সব দেবতাগণ দু'চারটা ফাঁকা বুলি ছেড়ে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের নামে তারা মুসলমানদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করে রেখেছে। অথচ এসব জাতীয়তাবাদ ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের ফয়সালা হচ্ছে, রং, বর্ণ, ভাষা, এলাকা ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে ভাগ করা বা খন্ড খন্ড করা কুফরী কাজ এবং জাহিলিয়াতের কুপ্রথা। ইসলামের ঘোষণা, মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই এক জাতি। চাই সে রং, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক

www.nagorikpathagar.org

অবস্থানের দিক থেকে যাই হোক না কেন। (সূরাহ্ হুজুরাত, ১০ / মা'আরিফুল কুরআন ১ ঃ ৬৩/ ৮ ঃ ৪৬৩) কিন্তু মুসলমানগণ দ্বীনী ইলমের অভাবে এ সবই হজম করে যাচ্ছে।

এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে স্বীকার করতেও আজ মুসলমানরা দ্বিধা বোধ করছে না। অথচ কোন মুসলমান যদি দ্বীন-ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তাহলে সে এক মুহূর্তের জন্যও ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না। বরং তাকে সর্বক্ষণ ইসলাম ধর্মের পক্ষে থাকতে হবে। ইসলাম ধর্মকে কায়িম করার জন্য জান-মাল, ইজ্জত–আবরু সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে পারবে না। বিজাতীয় কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে সে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখতে পারবে না বা তাদের সহযোগিতা করতে পারবে না। কারণ, সে ঈমানের দাবীদার। আর ঈমানের অঙ্গ হলো–আল্লাহর জন্য মুসলমানদের মুহাব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য আল্লাহর দুশমনের সাথে দুশমনী রাখা। (বুখারী শরীফ, ১ ঃ ৬)

সারকথা, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান বুঝে বা না বুঝে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গণতন্ত্র নামক ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বাতিল মতবাদের বেড়াজালে আটকে পড়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা মনে-প্রাণে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ঘৃণা করবো। কোনক্রমেই এটাকে সমর্থন করবো না। কারণ, এটা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ। অনেকে গণতন্ত্র কায়িমের জন্য বা পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ ঘোষণা করে। এটা তাদের মূর্খতা। কারণ, কুফরী মতবাদ কায়িম করার জন্য জিহাদ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা জনগণের ঈমানের হিফাজতের লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের অনিষ্টতা থেকে লোকদের সচেতন করবো। দাওয়াত, তা'লীম ও খিদমতের মাধ্যমে দেশে ইসলামী পরিবেশ কায়িম করবো এবং আল্লাহ্ তা'আলা যখনই সুযোগ দিবেন, তখনই এসব কুফরী মতবাদ দূরে নিক্ষেপ করে কুরআনী বিধান জারী করবো।

প্রচলিত জাতীয়তাবাদ ইসলামবিরোধী

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে (সূরাহ্ ফাতিহা ঃ ৬-৭, সূরাহ্ বাকারা-৬, সূরাহ্ কাহাফ-২৯, সূরাহ্ তাগাবুন–২) মানব জাতিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা ঃ কাফির ও মুমিন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, সমগ্র আদম সন্তান

www.nagorikpathagar.org

পরস্পরে ভাই ভাই এবং সমগ্র পৃথিবীর মানব মন্ডলী একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করা এবং ভিন্ন একটি গ্রুপ বা দল সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হলো, সে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করে দিল। সুতরাং বুঝা গেল যে, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি শুধু ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতেই হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, গোত্র, স্থান ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কোনটাই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করতে বা কোন গ্রুপ বা জাতি সৃষ্টি করতে পারে না। একই বাপের সন্তান যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে, কিংবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের পরস্পরের গঠন-আকৃতি ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের এই বর্ণ, ভাষা ও স্থানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা পরস্পরে ভাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারে না।

জাহিলিয়াতের যুগে বংশ ও গোত্রের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করেই জাতিসত্তার মাঝে বিভিন্নতা সৃষ্টি হত। এমনিভাবে রাষ্ট্র ও এলাকার উপর ভিত্তি করে মানুষেরা জাতি-উপজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে রূপ নিত।

মহানবী (সাঃ) এসে এসব অবাস্তব ভিত্তির মূলোৎপাটন করেন এবং মুসলমান যে কোন দেশের, যে কোন এলাকার, যে কোন বর্ণের, যে কোন গোত্রের এবং যে কোন ভাষাভাষীর হোক না কেন, সবাইকে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। যেমন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–"সমস্ত মুমিন পরস্পরে ভাই ভাই" (সূরাহ্ হুজুরাত-১০)। এমনিভাবে কাফির যে কোন রাষ্ট্রের বা যে কোন গোত্রেরই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা একই দলভূক্ত বা অভিন্ন যোগসূত্রে গ্রোথিত।

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী নবীজীর (সাঃ) সঙ্গী হলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে একজন ছিলেন খুবই রসিক প্রকৃতির। তিনি জনৈক আনসারী সাহাবীর কোমরে হাত দ্বারা হালকা আঘাত করলেন। এতে আনসারী সাহাবী অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। অর্থাৎ আনসারী সাহাবী আনসারগণকে আর মুহাজির সাহাবী মুহাজিরগণকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে আহবান জানালেন। ইতিমধ্যেই রাসূল (সাঃ) সেখানে উপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

হলেন, তিনি বললেন, এটা কেমন জাহিলিয়্যাতের আওয়ায! (বুখারী, ১ ঃ ৪৯৯)

যে সকল সাহাবী মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তারা হয়েছেন মুহাজির। আর যারা মদীনায় থেকে মুহাজিরগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হয়েছেন আনসার। এতে দোষের কিছুই নেই। বরং এটা তাদের পরিচিতির জন্য জরুরী। কিন্তু এটাকে ভিত্তি করে কোন ব্যাপারে যখনই তারা দুই দলে বিভক্ত হতে যাচ্ছিলেন, তখনই রাসূলে আকরাম (সাঃ) খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং এটাকে জাহিলিয়্যাত আখ্যা দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি ও হাদীসটি একথার পক্ষে প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে শুধু মাত্র কাফির ও মুমিন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতাকে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কুদরত ও মানুষের সামাজিক জীবনে পরিচয়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট ফায়দার বস্তু বলে বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আদম সন্তানকে তা জাতিভেদ ও দলভেদের ভিত্তি বানানোর অনুমতি দেননি।

ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে দুই জাতির মধ্যে যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করা হয়, তা একটি ইচ্ছাধীন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কেননা, ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন বস্তু। যদি কোন ব্যক্তি এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে শামিল হতে চায় বা বাতিল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র সহীহ ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অনায়াসেই তার আকীদা ও বিশ্বাসকে পাল্টিয়ে উক্ত ধর্মে শামিল হতে পারে। কিন্তু বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, দেশ, ভৌগলিক অবস্থান ও জন্মভূমি কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয় যে, সে তার বংশ ও বর্ণকে পাল্টিয়ে দেবে। এ কারণেই কোন ভাষার ভাষী ও কোন এলাকার বাসিন্দা তাদের ভাষা ও আঞ্চলিকতা পাল্টিয়ে সাধারণতঃ অপর গোত্রের আচার-আচরণ ও ভাষায় সহজেই একাকার হতে পারে না। যদিও সে উক্ত ভাষায় কথা বলতে থাকে এবং উক্ত স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

এটাই ইসলামী সৌহার্দ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ–যা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কালো-ধবল, আরব-অনারবের অসংখ্য মানুষকে একই সূত্রে গ্রোথিত করেছে। যাদের শক্তি সামর্থের মুকাবিলা দুনিয়ার কোন গোত্রই করতে পারেনি। তারা বিরাট ঐক্যসমৃদ্ধ বিশ্বব্যাপিত ইসলামী জনবলে বলিয়ান ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর মানুষ পুনরায় উক্ত জাতীয়তাবাদের কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামের মাধ্যমে নিঃশেষিত করে দিয়েছেন। এ সুযোগে পরবর্তীতে আবার বিধর্মীরা মুসলমানদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রাষ্ট্র, সীমা-পরিসীমা, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও গোত্রে টুকরা টুকরা করে বিভক্ত করে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত রেখে দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণের পথ সুগম হয়েছে। যার পরিণতি আমরা আজ চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুসলমান যারা একই দলভূক্ত ও একটি শরীরের ন্যায় ছিল, তারা আজ ছোট ছোট দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করায় মত্ত হয়েছে। উপরন্তু তাদের মুকাবিলায় সকল তাগুতি শক্তির মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিধর্মীরা সবাই সম্মিলিত জোটরূপে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণে মিল্লাতে ওয়াহিদাহ্ তথা একই দলবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। (মা'আরিফুল কুরআন, ৮ ঃ ৪৪৯, ৪৬৩)

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুসলমান যে এলাকা বা যে স্থানেই থাকুক, যে ভাষা ও বর্ণভূক্ত হোক, তারা সকলে একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম আঞ্চলিক কিংবা ভাষা বা গোত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে না। বরং ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বব্যাপী একক জাতীয়তাই হচ্ছে ইসলামের জাতীয়তাবোধ।

আজকের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ কিংবা ধম নিরপেক্ষতাবাদ যাই বলা হোক না কেন, তা সবই ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। কোন মুসলমান তা সমর্থন করতে পারে না বা তার পক্ষে মদদ যোগাতে পারে না।

সুতরাং আসুন, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে চিরতরে বর্জনের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী কুফরী জাতীয়তাবাদকে এবং ধর্মবিবর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা ও বিদূরিত করে সকলে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাই। আজ এটাই আমাদের ঈমানের দাবী।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তি সহীহ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে দোযখ হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)

পরিবেশনায়
রাহ্‌মানিয়া পাবলিকেশন্স
জামি'আ রাহ্‌মানিয়া ভবন (২য় তলা)
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১৩৬৯০,৮১৮৮৭৩

www.nagorikpathagar.org